ভাগবত-জীবন–শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-কথামৃত

শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ

মানব-জীবনের লক্ষ্য কি?

শ্রুতিবাক্যে আমরা দেখিয়াছি যে, জীব আনন্দস্বরূপ হইতেই জন্মিয়াছে, আনন্দস্বরূপের দিকেই গমন করিতেছে, আনন্দস্বরূপেই প্রবেশ করিবে।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, আনন্দস্বরূপের দিকে গমনের পথে জীব বহু বহু যোনি অতিক্রম করিয়া শেষে এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়াছে। মানবের জ্ঞানশক্তি, কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি উপযুক্তরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হওয়াতে সে বিবিধ সাধনপথের অধিকারী হইয়াছে। মনুষ্য-জন্মেই জীব স্বীয় সাধনবলে সেই আনন্দস্বরূপের সাধর্ম্য, সারূপ্য বা সাযুজ্য লাভ করিতে পারে, উহাই মানব-জীবনের লক্ষ্য।

ভাগবত-জীবন কাহাকে বলে?

জীবের অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি – এই তিনটি সাধনবলে বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমুখী হইয়া পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত হইলেই জীব ঐশ্বরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। উহাতেই সচ্চিদানন্দের সাধর্ম্যলাভ, উহাই ভাগবত জীবন। ইহা সিদ্ধির অবস্থা। এই সিদ্ধ্যবস্থা লাভ করিবার জন্য যাঁরা শ্রীভগবানের উপদিষ্ট সাধনমার্গের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকেও ভক্ত বা ভাগবত বলা হয়। সুতরাং সাধনাবস্থায় ভাগবত-জীবন বলিতে ভক্তের জীবন অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ভক্তগণ কিরূপ ভাবে জীবন যাপন করেন, কিরূপ ভাবে সংসারে বিচরণ করেন, কিরূপ ভাবে সাধন-ভজন করেন এ সকলও বুঝায়।

> মানবহৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে সেই সকল যখন দূর হয়, তখন মরণধর্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করে, ব্রহ্ম প্রাপ্তিজনিত সুখ লাভ করে।

প্রঃ। শাস্ত্রে আছে, জীব ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করে (গীঃ ১৪/২৬)। উহাই তো মোক্ষ, সংসার ক্ষয় - উহাতেই তো সর্বার্থসিদ্ধি। মোক্ষলাভের পর, সংসার-ক্ষয়ের পর, আবার জীবন কোথায়? সুতরাং সিদ্ধ্যবস্থাকে ভাগবত-জীবন বলিবার সার্থকতা কি?

উঃ। শাস্ত্রে ভগবদ্বাক্যে, যেমন এ কথা আছে যে, জীব ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি এ কথাও আছে যে, জীব আত্যন্তিক ভক্তিযোগদ্বারা ত্রিগুণাতীত হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হয় (ভাঃ ৩/২৯/১৪)। কথা একই, তিনিই তো ব্রহ্ম। সুতরাং ভগবানের ভাব বা সাধর্ম্য প্রাপ্ত যে জীবন, তাহাকে ভাগবত জীবন বলিলে কি অসঙ্গতি হয়? বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায়ের মোক্ষের ধারণা বিভিন্নরূপ, এই হেতু মোক্ষের পরে আবার জীবন কি, এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আমরা পূর্বে মায়াবাদী, মোক্ষবাদী, দুঃখবাদী, এবং সুখবাদী, লীলাবাদী, জীবনবাদী সাধকের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছি।

যাঁহারা মায়া-মোক্ষবাদী, তাঁহারা জ্ঞানযোগ বা ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া আমাকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া মোক্ষ বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির চেষ্টা করেন। তাঁহাদের পক্ষে ভাগবত-জীবন বলিয়া কোন কিছু নাই, কেননা তাঁহাদের নিকট জীবনটাই স্বপ্ন, মায়া এবং মিথ্যা। জীবন অর্থই কর্ম, তাঁহাদের কর্ম নাই, তাঁহাদের মতে কর্ম লোপ না পাইলে মোক্ষ লাভই হয় না। কিন্তু যাঁহারা লীলাবাদী, জীবনবাদী, তাঁহাদের মতে জগৎ সত্য, জীবন সত্য, কর্মও সত্য – এ সকল হইতেছে লীলাময়ের লীলা – এ জগৎ লীলা, মিথ্যা নয়,– তাই তাঁহারা তাঁহাদের জীবন, তাঁহাদের সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়া তাঁহার লীলাপুষ্টির জন্য তাঁহারই কর্মবোধে কর্ম করেন। ত্রিগুণের মূলে রহিয়াছে কামনা-বাসনা। সর্বকামনা ত্যাগ করিয়া ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়াও ভগবানের কর্মবোধে লোকরক্ষার্থে ও লোকহিতার্থে কর্ম করা চলে এবং ভাগবত-ধর্মে তাহাই বিহিত। এইরূপ জীবনকেই ভাগবত-জীবন বলা হয়।

অন্য ভাষায় বলিলে ইহাই ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত জীবন বা ব্রাহ্মীস্থিতি। কামনাসকল ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্মভাব লাভ হয় এবং তাহা এই জীবনেই ঘটিতে পারে, ইহা ব্রহ্মবিদ্যা বা উপনিষৎ শাস্ত্রেরই কথা-

'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
... এতাবদ্ধ্যনুশাসনম্'।। –কঠ ২/৩/১৪-১৫

–মানবহৃদয়ে যে সকল কামনা আশ্রিত আছে সেই সকল যখন দূর হয়, তখন মরণধর্মা মানুষই অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ করে, ব্রহ্ম প্রাপ্তিজনিত সুখ লাভ করে। এইটুকু মাত্রই সর্ববেদান্তশাস্ত্রের সার উপদেশ।

এইটুকু মাত্রই সমগ্র ভাগবত শাস্ত্রেরও উপদেশ - কামনা ত্যাগ কর, সতত আমাতে চিত্ত রাখ, তোমার সমস্ত কর্ম মনে মনে আমাতে অর্পণ করিয়া আমার কর্মে পরিণত কর, আমার ইচ্ছায় আমার ভৃত্যবোধে আমার লীলারক্ষার্থ লোকহিতার্থে অনাসক্ত চিত্তে কর্ম কর। সর্বকর্ম করিতে থাকিলেও মৎপ্রসাদে আমাকেই পাইবে (গীঃ ১৮/৫৬)। ইহাই ভাগবত-জীবন, ইহাই ভাগবত-ধর্ম।

শ্রীভগবান শ্রীগীতায় অর্জুনকে এবং শ্রীভাগবতে উদ্ধবকে এই ধর্মতত্ত্ব এবং এই ধর্মসাধন সম্বন্ধে সবিস্তার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই সকল কথার অনুবাদ করিয়াই আমরা এই বিষয়টি সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিব।

প্রঃ। কিন্তু মূল কথাটাই সম্যক্ বুঝিয়া উঠা কঠিন। সৃষ্টি ত্রিগুণময়, জীব ত্রিগুণের অধীন। ভগবান, ত্রিগুণাতীত, সুতরাং জীব ঐশ্বরিক প্রকৃতি বা ভগবানের সাধর্ম্য লাভ করিবে কিরূপে?

উঃ। এ প্রশ্নের উত্তর বুঝিবার পূর্বে প্রশ্নটির অর্থ কি তাহাই ভালরূপ বুঝা উচিত। জীব বলিতে কি বুঝায়? জীব দেহ বা ইন্দ্রয়াদি নয়, জীব হইতেছেন দেহী অর্থাৎ দেহে যিনি আবাস লইয়াছেন সে আত্মা। সুতরাং প্রশ্নটির অর্থ হইল যে, জীবাত্মা ত্রিগুণের অধীন, প্রকৃতি-পরতন্ত্র, তাহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সুতরাং তিনি ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বর-সারূপ্য পাইবেন কিরূপে? অল্প কথায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চলে না। শ্রীভাগবতে পরম ভাগবত উদ্ধব এই প্রশ্নও উত্থাপন করিয়াছেন এবং শ্রীভগবানও তাঁহার সবিস্তার উত্তর দিয়াছেন। তাহাই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

উদ্ধব। বিভো! ত্রিগুণের মধ্যে থাকিয়া জীব কিরূপে ত্রিগুণ অতিক্রম করিবে? গুণকর্মের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে দেহী দেহজাত কর্ম ও সুখাদিতে

কিরূপে বদ্ধ না হইয়া থাকিবে? আর কোন কোন মতে বলা হয়, গুণগণের সহিত দেহেরই সম্বন্ধ, আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। তাহা হইলে জীব দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মে এবং তজ্জনিত সুখদুঃখে বদ্ধ হয় কেন? এই আমার প্রশ্ন। তবে কি একই আত্মা নিত্যবদ্ধ ও নিত্যমুক্ত? এই আমার ভ্রম হইতেছে। (ভাঃ ১১/১০/৩৫-৩৭)।

শ্রীভগবান। প্রকৃতি-দ্বারে আমি সৃষ্টি করি। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির এই তিন গুণ। প্রকৃতিকেই মায়া বলা হয়, উহা আমারই সৃজনী শক্তি। আমার সত্ত্বাদি গুণরূপ উপাধিবশত আত্মাকে বদ্ধ বা মুক্ত বলা হইয়া থাকে। বস্তুত তিনি তাহা নহেন, স্বরূপত তাহার বদ্ধ-মোক্ষ নাই। আমি কি কেবল জীবকে বদ্ধ করিবার জন্য ত্রিগুণ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছি? না, তাহা নহে। বস্তুত সৃষ্টিতে বদ্ধ-মোক্ষকারী আমার দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে - অবিদ্যা (অজ্ঞান) ও বিদ্যা (জ্ঞান)। একান্তভাবে আমার শরণ লইলে আমিই তাহার অবিদ্যা দূর করিয়া জ্ঞান দান করি। আমার অংশস্বরূপ অনাদি জীবেরই অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ হয় এবং বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ হয়।- ভাঃ ১১/১১/১,৩,৪

উদ্ধব। আপনি বলিলেন, জীব আপনার সনাতন অংশ। আপনি একথাও বলিয়াছেন যে, আপনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন। আপনি কি হৃদয়ে জীবাত্মারূপে অবস্থিত না পরমাত্মারূপে অবস্থিত?

শ্রীভগবান্। জীবাত্মা ও পরমাত্মা, উভয়রূপেই জীব-হৃদয়ে অবস্থিত আছি। ব্যাপারটি কিরূপ শোন - এক বৃক্ষে (দেহে) দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) নীড় নির্মাণ করিয়া একত্র বাস করে। ইহারা পরস্পর সদৃশ ও সখা। একটি পক্ষী বৃক্ষের সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে (বিষয় ভোগ করে), অপরটি নিরাহার হইলেও নিজ বলে শ্রেষ্ঠতর। যিনি ফল ভক্ষণ করেন না তিনি আপনাকে ও অন্যকে জানেন, তিনি বিদ্বান। যিনি ফল ভক্ষণ করেন (বিষয় ভোগ করেন) তিনি সেরূপ নহেন। তিনি অবিদ্যার সহিত সংযুক্ত, তাই তিনি নিত্যবদ্ধ। যিনি বিদ্যাময় তিনি নিত্যমুক্ত। - ভাঃ ১১/১১/৬-৭

এই শ্লোকটি প্রায় অনুরূপ ভাষায় শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। ('দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, ইত্যাদি মুঃ ৩।১-২, শ্বেত ৪। ৬-৭ দ্রঃ)। এই উপমা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহারা উভয়ে সদৃশ এবং পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন, ইহাদের মধ্যে ভেদেও অভেদ।

যাহা হউক, জীবের সংসার-বন্ধনের প্রকৃত কারণ হইতেছে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। কিন্তু মনুষ্য উচ্চতর স্তরের জীব বলিয়া তাহার জ্ঞানও অনেকটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সে যে প্রকৃতির ত্রিগুণে বা বিষয়-মায়ায় আবদ্ধ সে জ্ঞান অনেকের না আছে তাহা নয়; অথচ তাহারা মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নই পরে উদ্ধব উত্থাপিত করিলেন।

উদ্ধব। প্রভো, মনুষ্যেরা অনেকেই বিষয়-সকলকে আপদের স্থান বলিয়া মনে করে; তথাপি কেন কুক্কুর, গর্দভ ও ছাগলের ন্যায় সেই সকল বিষয় উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়? - (ভাঃ ১১/১৩/১১)

শ্রীভগবান। অবিবেকী ব্যক্তির হৃদয়ে এই দেহটাকে অবলম্বন করিয়া 'আমি' এই মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে মন ঘোরতর রজোগুণে সংবদ্ধ হয়; রজোযুক্ত মনে বিবিধ সংকল্প-বিকল্প উৎপন্ন হয়; তাহা হইতেই বিষয়-চিন্তা-জনিত নানারূপ দুঃসহ কামনা-বাসনার উদ্ভব হয়। এইরূপে রজোগুণে বিমোহিত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভাবী ফল দুঃখজনক বুঝিয়াও বিবিধ কামনার বশবর্তী হইয়া কর্মসকল করিয়া থাকে। মনকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া অল্পে অল্পে সমাধি অভ্যাস করিবে, এ সম্বন্ধে আমার শিষ্য সনকাদি এইরূপ যোগোপদেশ দেন।– ভাঃ ১১/১৩/৮-১৪

উদ্ধব। বিভিন্ন মুনিঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেয়ঃসাধন নির্দেশ করিয়া থাকেন। আপনি অহৈতুকী ভক্তিযোগ উপদেশ করিয়াছেন। লোকে অন্যান্য মতও অনুসরণ করিয়া থাকে। এই সকল মত কি স্ব-স্ব-প্রধান, না বৈকল্পিক? এ সকল মতভেদের কারণ কি?

শ্রীভগবান্। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যূনাধিক্যবশত মানবগণের প্রকৃতি বিভিন্ন হয় এবং তাহাদের বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এইরূপ প্রকৃতি-বৈচিত্র্যহেতু শ্রেয়ঃ-সাধন সম্বন্ধে তাহাদের মতও বিভিন্নরূপ হয়। কেহ কেহ আবার বুদ্ধিবিচার না করিয়া পরম্পরাগত প্রথারই অনুবর্তন করিয়া থাকে। আবার অনেক পাষণ্ডী মতও আছে। এ সকলের ফল তুচ্ছ।

যিনি আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং সকল বিষয়ে নিরপেক্ষ, আত্মস্বরূপ আমাদ্বারা তাহার যে সুখ হয়, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের সে সুখ কোথায়? যিনি আমাদ্বারাই সন্তুষ্টচিত্ত, তাহার সমস্ত দিক সুখময়। (ভাঃ ১১/১৪/১৩)।

উদ্ধব। বিষয়ী লোকে বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও কি আপনার সাধন ভজন করিতে পারে?

শ্রীভগবান। কথা হইতেছে এই যে - বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হইয়া পড়ে, আর আমার চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত আমাতেই বিলীন হয়। -ভা ১১/১৪/২৭)। সুতরাং বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যদি চিত্তটি বিষয়ে না রাখিয়া আমাতে যুক্ত রাখিতে পারে, তবে আর কোনও আশঙ্কা নাই। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত না থাকাতে যদি আমার ভক্ত বিষয়কর্তৃক আকৃষ্টও হন, তথাপি অন্তরে প্রগাঢ় ভক্তি থাকাতে তিনি প্রায়ই বিষয়ে অভিভূত হন না, একেবারে বিষয়-কীট হইয়া পড়েন না। - ভাঃ ১১/১৪/১৮)। প্রশ্ন করিয়াছিলে, জীব ত্রিগুণের অধীন, কামনা বাসনায় অভিভূত, সে আমার সাধর্ম্য বা স্বরূপতা লাভ করিবে কিরূপে? আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হয়, ভক্তির প্রভাবেই মানবাত্মা কামনা-নির্মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়–

'যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।

আত্মা চ কর্মানুশরং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥- ভা ১১/১৪/২৫

– যেমন স্বর্ণ অগ্নির উত্তাপ-সংযোগে ভিতরের ময়লা পরিত্যাগ করিয়া নিজের বিশুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা মদভক্তিযোগদ্বারা বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক মৎস্বরূপতা লাভ করে।

–কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।

বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ'। - ভাঃ ১১/১৪/২৩

–ভক্তি বিনা কিরূপে চিত্ত কামনা-বাসনা হইতে নির্মুক্ত হইবে। শরীরে রোমাঞ্চ, হৃদয়ে আর্দ্রভাব এবং নয়নে আনন্দাশ্রুকণা ভিন্ন ভক্তিই বা কিরূপে জানা যায়?

উদ্ধব। কিন্তু প্রভো, নিষ্কাম-ভক্তিও তো সুদুর্লভ। চিত্তে বিষয়-বাসনা থাকিতে কিরূপে এরূপ বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় হইবে? বিষয়-বিমুগ্ধ, কামনা-কলুষ জীবের হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইবে কিরূপে? নয়নে আনন্দাশ্রু আসিবে কোথা হইতে?

শ্রীভগবান। ভক্তিযোগেই ভক্তি আসিবে, সাথে সাথে আর সব আসিবে। প্রথমে চাই শ্রদ্ধা। যাহার আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি যদি বিষয় সকল দুঃখাত্মক জানিয়াও ঐ সকল পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলেও সেই শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি, এক ভক্তি হইতেই সমুদয় হইবে, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সেই সকল কামনা উপভোগ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গে দুঃখজনক বলিয়া উহাদের নিন্দা করিবেন। তৎপর প্রীতির সহিত আমার ভজনায় প্রবৃত্ত হইবেন। এইরূপ মৎকথিত ভক্তিযোগে

নিরন্তর আমার ভজনা করিতে করিতে হৃদগত কামনাসকল নষ্ট হইয়া যায়, আমি তো হৃদয়ে অবস্থিত আছি। অখিলাত্মা আমার সাক্ষাৎ পাইলে তাহার হৃদয়-গ্রন্থি (অহঙ্কার, কামনা-বাসনা) ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূর হয়, তাহার কর্ম-বন্ধন ঘুচিয়া যায়।– ভাঃ ১১/২০/২৯-৩০।

উদ্ধব। জ্ঞান ব্যতীত কি হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, অহঙ্কার দূর হয়, কর্ম-বন্ধন ঘুচে? অজ্ঞানীর উপায় কি?

শ্রীভগবান। তাই তো বলিয়াছি, জ্ঞানস্বরূপ আমিই যে হৃদয়ে অবস্থিত আছি। অর্জুনকেও আমি এই কথা বলিয়াছিলাম–হৃদয়স্থ আমি উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা আমার ভক্তগণের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি - গীঃ ১০/১১।

আমার পুণ্যকথা শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারা যেমন যেমন আত্মা নির্মল হইতে থাকে তেমনি তেমনি সাধক সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করিতে থাকেন। - ভা ১১/১৪/২৬।

ভক্তিযোগে যে সাধকের চিত্ত আমাতে যুক্ত থাকে তাহার পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য (বিষয়-গ্রহণ না করা) প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। - ভাঃ ১১/২০/৩১। ক্রিয়াযোগের দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা, আর যোগের দ্বারা, দান ধর্মের দ্বারা বা অন্যান্য ব্রত নিয়মানুষ্ঠান দ্বারা যাহা লাভ করা যায় তৎ সমস্তই আমার ভক্ত মদীয় ভক্তিযোগদ্বারা অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন এবং ইচ্ছা করিলে স্বর্গ, মোক্ষ বা আমার লোক (গোলোক, কি বৈকুণ্ঠ) লাভ করিতে পারেন (ভাঃ ১১/২০/৩২-৩৩)। কিন্তু আমার প্রতি একান্ত প্রীতিযুক্ত ভক্তগণ কিছুই অভিলাষ করেন না, কৈবল্য বা পুনর্জন্মনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ দিতে চাহিলেও নিতে ইচ্ছা করেন না (ভাঃ ১১/২০/৩৪)। এই যে আমা ব্যতীত আর কিছুই অভিলাষ না করা, আর কোন-কিছুরই অপেক্ষা না করা, সর্ববিষয়ে নৈরপেক্ষভাব, ইহাই পরম নিঃশ্রেয়স। ইহাই নির্গুণা ভক্তি। আমার একান্ত ভক্তগণের ত্রিগুণের বন্ধন নাই (ভাঃ ১১/২০/৩৫-৩৬)। এইরূপে নিষ্কাম ভক্তগণ গুণসঙ্গপরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগে একমাত্র আমাতেই একনিষ্ঠ হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হন (ভাঃ ১২/২৫/৩২)।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি গীতা-ভাগবতে সিদ্ধ্যবস্থার বর্ণনায় ভগবদবাক্যে সর্বত্রই এই কথা আছে–'সাধক আমার ভাবপ্রাপ্ত হন (গীঃ ১৩/১৮)। এখানেও সেই কথা। 'আমার' ভাব কি? – কেহ বলেন– মোক্ষ (শঙ্কর), কেহ বলিয়াছেন, মৎসাযুজ্য (শ্রীধর), কেহ বলিয়াছেন, মৎস্বরূপতা (চক্রবর্তী), আবার কেহ বলিয়াছেন, 'আমার ভাব' অর্থ আমাতে ভাব, রতি বা প্রেম (শ্রীজীব)। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণের অনেকেই শেষোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভক্তিমার্গের দিক হইতে দেখিলে এই ব্যাখ্যা সুসঙ্গত, সন্দেহ নাই। রাগানুগ ভক্তগণ তো সাযুজ্য সারূপ্যাদি মোক্ষ বাঞ্ছা করেন না, তাঁহাদের অভীষ্ট - 'পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দমৃত-সিন্ধু, মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু (চৈঃ চঃ)– শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে ভক্তিসুখসম্পদই তাঁহাদের জীবনের সারবস্তু। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে 'আমার ভাব প্রাপ্ত হন' কথার 'মোক্ষপ্রাপ্ত' হন, এরূপ ব্যাখ্যা করার কোন সার্থকতা নাই। স্থূল কথা এই যে, জীবাত্মা দেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ত্রিগুণের অধীন হন, এবং তজ্জনিত কামনা-বাসনায় বিমুগ্ধ হইয়া 'আমি' 'আমার' ভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন। সাধক যখন এই দেহ-চৈতন্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে (গীঃ ৬/২৮), অথবা আত্মচৈতন্যে (গীঃ ৬/২৯) অথবা ভাগবত-চৈতন্যে (গীঃ ৬/৩০) অবস্থান করেন, তখনই তিনি ভাগবত স্বভাব বা সাধর্ম্য প্রাপ্ত হন। এক তত্ত্বই ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান – এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত হন এবং সাধকের ভাববৈশিষ্ট্য হেতু ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত হন। সুতরাং ব্রহ্মবাদী জ্ঞানযোগীর সিদ্ধ্যবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্মসিদ্ধি বা ব্রাহ্মীস্থিতি, আত্মসংস্থ ধ্যানযোগীর সিদ্ধ্যবস্থাকে বলা হয় কৈবল্য-সিদ্ধি; ভক্তগণ ব্রহ্ম-নির্বাণ বা কৈবল্য বাঞ্ছা করেন না, তাঁহাদের সিদ্ধ্যবস্থাকে বলা হয় ভাগবত জীবন। এই জীবন, ভগবৎসেবায় অর্পিত; ভগবৎকর্মে উৎসর্গীকৃত।

প্রঃ। ভক্তিযোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত ভগবদ্বাক্যে একটি কথা আছে- এই পথে জ্ঞান বা বৈরাগ্য প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। অন্যত্র ভগবদ্বাক্যেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রশংসাও আছে। সুতরাং এই কথাটির মর্ম ভালরূপ বুঝা গেল না।

উঃ। জ্ঞানের প্রয়োজন তো আছেই, কিন্তু জ্ঞান বলিতে অনেক কিছু বুঝায় যাহা ভক্তিমার্গে বিশেষ প্রয়োজনে আসে না, বরং ভক্তি-সাধনার অন্তরায় হয়; যেমন নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম-চিন্তায় ভাবভক্তির কোন স্থান নাই, সগুণ ঈশ্বর-চিন্তা ভিন্ন ভক্তির বিকাশ সম্ভবপর নয়। আবার, অদ্বৈত চিন্তায় - আমি ব্রহ্ম এই ভাবেও ভক্তির অবকাশ নাই। আবার, এই সৃষ্টি স্বপ্নবৎ, এই জগৎ-প্রপঞ্চ মায়াময়, মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞানকেও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলা হয়; কিন্তু ভক্তগণ লীলাবাদী, এই সৃষ্টি, এই জগৎ-লীলা আনন্দময়ের আনন্দ-লীলা, ইহাই ভক্তিবাদের কথা। সংসার-প্রপঞ্চ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে ভগবানের লীলাও মিথ্যা হয়, লীলাময়ও মিথ্যা হইয়া পড়েন; জীব, জগৎ, ঈশ্বর - সকলই স্বপ্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ জ্ঞানচর্চা ভক্তিমার্গে শ্রেয়স্কর নয়, বলাই বাহুল্য। 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শনম'- গীঃ ১৩/৮ - ইহাও জ্ঞানের লক্ষণ, এইরূপ বলা হয়। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-সঙ্কুল দুঃখময় এই সংসার, জীব ত্রিতাপে তাপিত, দুঃখকষ্টে ম্রিয়মাণ – এইরূপ দুঃখের চিন্তায় চিত্ত ভারাক্রান্ত হইলে দয়াময়, প্রেমময়, সুখস্বরূপ সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনুরাগের শৈথিল্য জন্মিতে পারে, এমন কি, তাঁহাতে অবিশ্বাসও আসিতে পারে। সতত দুঃখচিন্তায় যাহারা মুখ ভার করিয়া থাকে তাহারা আনন্দস্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, এ পথে চাই প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা। এই সকল 'জ্ঞানের' লক্ষণ বা 'জ্ঞানীর' লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিমার্গে উহাদের বিশেষ উপযোগিতা নাই।

প্রঃ। কিন্তু বৈরাগ্যও ভক্তিমার্গে প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না, একথার অর্থ কি? এদেশের ভক্তগণ তো সকলেই 'বৈরাগী'।

উঃ। বৈরাগ্য বলিতে বুঝায়– (১) বিষয়-কামনা-ত্যাগ (২) বিষয়-ভোগ ত্যাগ। কামনা-ত্যাগ না হইলে কেবল বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিলেই বৈরাগ্য হয় না। মনে মনে ইন্দ্রিয়-বিষয় কামনা করিয়া বাহ্যত বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া 'বৈরাগী' হওয়া, উহা ফল্গুবৈরাগ্য, মিথ্যাচার (গীঃ ৩/৬)। কিন্তু বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়া অনাসক্তভাবে যথাপ্রাপ্ত বিষয়ভোগ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। বরং ভক্তিমার্গে একেবারে বিষয়-গ্রহণ ত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনাদি করা শ্রেয়স্কর নহে, উক্ত বাক্যের ইহাই মর্ম। বিষয়াসক্তিই ঈশ্বর-প্রাপ্তির অন্তরায়, অনাসক্তচিত্তে বিষয়ভোগ অন্তরায় নহে, বরং সহায়ক। কিরূপে? - পূর্বেই বলা হইয়াছে, ভক্তিবাদ জগৎ অস্বীকার করে না, জগৎ-প্রপঞ্চ মায়া-মিথ্যা বলে না - এই সৃষ্টিতে আনন্দস্বরূপেরই প্রকাশ, ইহা তাঁহারই আনন্দলীলা। জগতের রূপ-রস সুন্দর হইয়াছে, সরস হইয়াছে, সেই আনন্দস্বরূপের, রসস্বরূপের স্পর্শে। বিষয়ের রূপ-রস, মানব-হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি-দয়া-মৈত্রী – এ সকল তো তাঁহারই রূপ-রস, স্নেহ-প্রীতির অভিব্যক্তি। ভক্তিপূতচিত্তে এ সকল তাঁহারই দানরূপে গ্রহণ করিলে ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দও সেই পরমানন্দের সন্ধান দিতে পারে। বিষয়ের মোহও প্রেমভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে। ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া, হৃদয়ের সুকোমল ভাবসকল নিষ্পেষণ করিয়া কেবল 'মোহ' 'মোহ' বলিয়া হা-হুতাশ করিলে চিত্ত-কাঠিন্য জন্মে, শুষ্কতা ও নীরসতা আসে। উহা প্রেমভক্তি সাধনার সহায়ক হয় না, বরং অন্তরায় হয়। এ বিষয়টি পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'- ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের এই কথাটির নানারূপ সমালোচনা হইয়াছে। উহা শ্রীভাগবতের পূর্বোক্ত কথারই পরিপোষক। নিচের কবিতাটিতে এই তত্ত্বটিই অনুপম ভাষায় পরিস্ফুট-

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
..... এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময়! প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া;
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

ইহা সৃষ্টিতে, প্রপঞ্চে আনন্দময়ের আনন্দলীলার অনুভূতি। প্রেমের চক্ষে সকলই সুন্দর, সকলই মধুময়, এসকল যে রসময়, দয়াময়, প্রেমময়ের দয়ার দান - এস্থলে বৈরাগ্যের কথা ওঠে না, এখানে বিশুদ্ধ ভোগ। কিন্তু যে সেই রসময়কে ভুলিয়া বিষয়রসে লোলুপ, বিষয়-বাসনায় মুহ্যমান, তাহার নিকট এ সমস্ত কথার কোনও মূল্য নাই। তাহার পক্ষে এইরূপ নির্লিপ্তভাবে বিষয়-ভোগ করা সম্ভবপরই হয় না। উপনিষদে একটি কথা আছে - যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত সমস্ত ভোগ্য বিষয় উপভোগ করেন (তৈত্তিঃ ২/১/৩)। বলা বাহুল্য যে, বিষয়-কামনা ত্যাগ না হইলে ব্রহ্মকে জানা যায় না, আর নির্বিশেষে কামনা ত্যাগ হইলে যখন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হয়, তখন সর্বপ্রকার বিষয়ানন্দও ব্রহ্মানন্দেরই অন্তর্ভুক্ত হয়, কেননা ব্রহ্ম ছাড়া তো বিষয় নাই। বেদান্তের ভাষায় তখন সকলই ব্রহ্মময়, ইহাই ব্রহ্মের সহিত বিষয়-ভোগ করা। ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায়, ইহাকেই 'কৃষ্ণের সংসার', 'কৃষ্ণের বিষয়' এই সকল কথা বলা হয়। কিন্তু মুখে বলা যত সহজ, 'আমার' সংসার, 'আমার' বিষয়কে 'কৃষ্ণের' সংসার বলিয়া প্রকৃত অনুভব করা তত সহজ ব্যাপার নহে, অনেক সময় এ সকল কথা বলিয়া আত্মবঞ্চনা করা হয় মাত্র। ইহাতে চাই - আমাদের ভাবনা, কামনা, কর্ম, বিষয়-আশ্রয় সকলই ঈশ্বরমুখী করা, ঈশ্বরে অর্পণ করা, ঈশ্বরে উৎসর্গ করা। এইরূপে ঈশ্বরে নিবেদিত জীবনের যে বিষয়ভোগ তাহাই বিশুদ্ধ। ভক্তিমার্গের প্রধান কথাই হইতেছে–শ্রীভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদন, উহাই ভাগবত-জীবন বা ভগবানে উৎসর্গীকৃত জীবন। এই কথাই উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন।

উদ্ধব। প্রভো, আপনি বলিলেন যে, যোগদ্বারা বা জ্ঞান-বৈরাগ্য বা তপস্যা দ্বারা যাহা যাহা লাভ হয় তৎসমস্ত ভক্তিযোগ দ্বারাই লাভ হইতে পারে। সেই ভক্তিযোগ সাধন সবিস্তার আমাকে উপদেশ করুন।

শ্রীভগবান। পূর্বে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে বলিয়াছি। আচ্ছা, পুনরায় বলিতেছি, ভক্তিযোগই ভক্তির কারণ–

প্রথম কথা - আমার অমৃতময়ী কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা শ্রবণান্তর তাহার অনুকীর্তন, আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা, স্তুতিবাক্যে আমার স্তব, আমার সেবাতে সমাদর, সর্বাঙ্গ দ্বারা আমার অভিনন্দন - এই সকল ভক্তিসাধনার সাধারণ অঙ্গ।

দ্বিতীয় কথা– কায়, মন, বাক্য সম্পূর্ণরূপে আমাতেই অর্পণ করিতে হইবে, সে কিরূপ? – শরীরের দ্বারা যে কোন কর্ম করিবে অর্থাৎ লৌকিক কর্মাদি আমার উদ্দেশ্যেই করিবে, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ কীর্তন করিবে, মনটি সম্পূর্ণরূপে আমাতেই অর্পণ করিবে।

তৃতীয় কথা- সর্ববিধ কামনাত্যাগ, কামনা-বাসনাও আমাতেই অর্পণ করিতে হইবে, আমা ভিন্ন অন্য কোন অভিলাষ থাকিবে না; আমার জন্য অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ করিবে। লোকে স্বর্গাদিকামনায় যজ্ঞদানাদি ধর্মকর্ম করে, সে সকল কর্মও - যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত-নিয়ম – এ সমস্তই আমার উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিবে। মোট কথা, ধর্ম, অর্থ, কাম - এই ত্রিবর্গ, যাহাকে সংসার-জীবনের পুরুষার্থ বলা হয়, তাহা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়া আমার উদ্দেশ্যেই আচরণ করিবে। লোকের লৌকিক কর্মসকলও যদি ফল কামনা না করিয়া আমাতে অর্পিত হয়, তবে তাহাতে ধর্মই হয় (ভাঃ ১১/২৯/২১)। এইরূপ যে মনুষ্যেরা আমাতে আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন, জীবনটি আমাতে সম্পূর্ণ অর্পিত করিয়াছেন, তাহাদেরই আমাতে ভক্তি জন্মে, তাহাদের সকল অর্থই সিদ্ধ হয়, তাহাদের আর কিছু প্রাপ্তব্য অবশিষ্ট থাকে না (ময়ি সঞ্জয়তে ভক্তিঃ - ভাঃ ১১/১৯/২৪।

আর একটি কথা এই - সর্বভূতে আমাকে চিন্তা করিবে (ভাঃ ১১/১৯/২১)। আমার প্রতিমাদির পূজার্চনা ও সেবা-পরিচর্যার কথা বলিয়াছি; কিন্তু আমি তো কেবল প্রতিমাতে নাই – আমি সর্বাত্মা, আমি তোমার হৃদয়েও আছি, সর্বভূতেও আছি (ভাঃ ১১/২৮/৪৮)। নির্মলচিত্ত হইয়া আপনাতে ও সর্বভূতে আমাকে অন্তরে বাহিরে পূর্ণ দর্শন করিবে (ভাঃ ১১/২৯/১২)। যিনি সর্বভূতে আমার সত্তা দর্শন করেন, অচিরে তাঁহার অহঙ্কার, স্পর্ধা, অসূয়া ও অভিমান নাশ পাইয়া থাকে (ভাঃ ১১/২৯/১৫)। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, স্বজনের হাসি-উপহাস উপেক্ষা করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, গর্দভ পর্যন্ত সমুদয় জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে (ভাঃ ১১/২৯/১৬)। যতদিন পর্যন্ত সর্বভূতে আমার সত্তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধ না হয় (ভাঃ ১১/২৯/১৭), ততদিন পর্যন্ত কায়মনোবাক্যে এইরূপ উপাসনা করিবে।

হে উদ্ধব, সর্বভূতে আমার অস্তিত্ব চিন্তা করা এবং কায়মনোবাক্যে সর্বভূতের সেবা করাই সকল ধর্মের মধ্যে সমীচীন, ইহাই আমার মত।–

–'অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।

মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ। (ভাঃ ১১/২৯/১৯)

এই আমি তোমাকে মদীয় নিষ্কাম ধর্মতত্ত্ব বলিলাম। ইহাতে ব্রহ্মবাদের সার কথা আছে (ভাঃ ১১/২৯/২৩)। ইহা বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি এবং মনীষীদিগের মনীষা (ভাঃ ১১/২৯/২২)। ইহা জ্ঞাত হইলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না। অমৃত পান করিলে আর কি পেয় অবশিষ্ট থাকে? (ভাঃ ১১/২৯/৩২)। মনুষ্য যখন নিজের জন্য কোন কর্ম না করিয়া আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া আমার কর্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, তখন সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার আত্মভূত হইবার যোগ্য হয় (ভাঃ ১১/২৯/৩৪)।

জ্ঞান, কর্ম, যোগাদি দ্বারা মনুষ্যের যে অর্থ লাভ হয় তোমার সম্বন্ধে সে সমুদয়ই আমি। একান্তভাবে আমার শরণ লইয়া আমার দ্বারাই অকুতোভয় হও (ভাঃ ১১/১২/১৫)। আমি তোমাকে বিস্তৃতরূপে যে শিক্ষা দিলাম নির্জনে তাহা চিন্তা করিবে, বাক্য ও চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট রাখিয়া আমার ধর্মে নিরত থাকিবে।

শ্রীশুকদেব নিম্নোক্ত স্তুতি-বাক্যে এই ধর্মোপদেশ প্রকরণের সমাপন করিয়াছেন–

'য এতদানন্দসমুদ্রসংভূতং জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্॥

কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা সশ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্বিমুচ্যতে।।" ভাঃ ১১/২৯/৪৮

–'যোগেশ্বরগণ যাঁহার চরণসেবা করেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভক্তের প্রতি কথিত' ভক্তিরূপ আনন্দসমুদ্রের সহিত একীকৃত এই জ্ঞানামৃত যিনি শ্রদ্ধার সহিত অল্প করিয়াও পান করেন, তিনি মুক্ত হন, তাঁহার সংসর্গে জগৎও মুক্ত হইয়া থাকে।'

'ভবভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।

অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্ পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥" - ভাঃ ১১/২৯/৪৯

যিনি ভবভয় নাম করিবার জন্য, ভ্রমর যেরূপ পুষ্প হইতে মধু উত্তোলন করে, তদ্রূপ বেদসাগর হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান বেদসার-সুধা উদ্ধার করিয়া ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন সেই নিগমকর্তা কৃষ্ণাখ্য আদ্য পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।'

এই বর্ণনা হইতে আমরা দেখিলাম যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের হিতার্থ যে বিশিষ্ট ধর্মমত উপদেশ করিয়াছেন তাহাই তিনি এ প্রকরণে বর্ণনা করিয়াছেন। 'আমার ধর্ম', 'আমার মত' এইরূপ কথা শ্রীভাগবতে ভগবদুক্তিতে অনেক স্থলেই আছে এবং শ্রীগীতাতেও অনুরূপ কথা আছে (গীঃ ৩/৩১-৩২)। বস্তুত শ্রীগীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে যে সকল বিষয় উপদেশ করিয়াছেন শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ৯ম হইতে ২৯শ অধ্যায়ে সেই সকল বিষয়েরই পুনরুল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীভাগবতের আলোকে দেখিলে শ্রীগীতোক্ত যোগধর্মটির স্বরূপ কি, তাহা আমরা স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারি। শ্রীভাগবতে ইহাকে ভক্তিযোগ বলা হইয়াছে এবং ভক্তির মাহাত্ম্য সর্বত্রই অতি উজ্জ্বলরূপে কীর্তিত হইয়াছে। এই ভক্তিযোগের স্বরূপটি কি পূর্বেই আমরা তাহা দেখিয়াছি (২২৪-২২৫ পৃঃ)। ইহাতে ভক্তির সহিত নিষ্কাম কর্মের এবং সর্বভূতে ভগবদ্ভাবরূপে জ্ঞানের সংযোগ আছে, অর্থাৎ ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম – এ তিনেরই সমাবেশ আছে। শ্রীগীতোক্ত ধর্মের উহাই মূল কথা এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ❑

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥

[অ : ৭, শ্লোক : ৯]

অনুবাদ ঃ আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভূতে জীবন এবং তপস্বীদিগের তপস্যা।

[অ : ৭, শ্লোক : ৯]

জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের শেষ উপদেশ

ভাগবত থেকে সংকলন

সাধুসঙ্গ প্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হয়। লোক জানে মানব জনমই একমাত্র ভজনের জনম। একমাত্র এই জন্মেই ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গের প্রভাবে দৈত্য, দানব, রাক্ষস এমনকি পশুপক্ষী পর্যন্ত আমার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ধব – তোমাকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাই।

দৈত্য-দানবের মধ্যে বৃত্রাসুর, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বলি, বাণ ও ময়দানব। বৃত্রাসুর পূর্বজন্মে বলরাম ও দেবর্ষি নারদের উপদেশ শুনিয়াছিলেন। বৃষপর্বার জননী জন্মের পরেই তাঁহাকে জঙ্গলে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে তিনি মুনিগণ কর্তৃক পালিত হন। তাঁহাদের সঙ্গগুণে তিনি বিষ্ণুভক্ত হন। বলিরাজা ভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র এবং তাঁহার কৃপায় ভক্তিপথে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। দয়াময় মহাদেব বাণাসুরের হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই সময় শিবের সঙ্গলাভে বাণ ভক্তি লাভ করে। ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে সভা নির্মাণকালে আমার ভক্ত পাণ্ডবদের সঙ্গ লাভ করিয়াছিল। তাহার ফলেই তাহার ভক্তি হইয়াছিল। রাক্ষসদের মধ্যে বিভীষণ আমার ভক্ত। বীরভক্ত হনুমানের সঙ্গ ফলে বিভীষণের ভক্তি লাভ। পক্ষীদের মধ্যে জটায়ু ভক্ত ছিল। সে পাইয়াছিল রাজা দশরথের সঙ্গ ও রাবণ কর্তৃক অপহরণকালে সীতার রক্ষার চেষ্টায় তাঁহার সঙ্গ। পশু-পক্ষীগণের মধ্যে সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্ববান্ ও গজেন্দ্র আমার ভক্ত। সুগ্রীবেরা পাইয়াছিল সীতার অনুসন্ধানরত লক্ষ্মণের সঙ্গ। গজেন্দ্রের পূর্বজন্মে হইয়াছিল নারদের সঙ্গ, পরজন্মে যখন কুম্ভীরের সঙ্গে যুদ্ধ হইয়াছিল তখন পাইয়াছিল বিষ্ণুবাহন গরুড়ের সঙ্গ। এইসব ভক্তসঙ্গের ফলে দৈত্যগণের, রাক্ষসগণের ও পশুপক্ষীগণেরও ভক্তি লাভ হইয়াছিল। মানুষের মধ্যেও তমোজ্ঞানী ব্যাধের ভক্তসঙ্গে ধর্মভাব হইয়াছিল।

ভক্তি দুই প্রকারের, বৈধী ভক্তি ও রাগময়ী ভক্তি। উভয়ই ভক্তসঙ্গ ফলে লাভ হয়। যাহারা বৈধীভক্তি লাভ করে তাহাদের প্রাপ্তি হয় মুক্তি, যাহারা রাগভক্তি লাভ করে তাহাদের প্রাপ্তি হয় প্রেম।

> যে পাখীটা ফল খায়, সে নিত্যবদ্ধ, তার আনন্দ মায়াবৃত। যে পাখীটা ফল খায় না, সে নিত্যমুক্ত, আনন্দপূর্ণ নিত্যানন্দে চিরতৃপ্ত। বিদ্যাযুক্ত, নিত্যমুক্ত, আর অবিদ্যাযুক্ত নিত্যবদ্ধ।

এইসব কথা বলিতে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের নিজের কথা মনে পড়িল। অতি আদরে উদ্ধবের কণ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন–উদ্ধব, ব্রজধাম তো তুমি দর্শন করিয়াছ, সেখানকার প্রিয়জনের ভক্তি তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তাহাদের ভক্তির নামই প্রেমভক্তি বা রাগাত্মিকা ভক্তি। তাহারা কোন বেদ-অধ্যয়ন, তীর্থগমন, তপস্যাচরণ করে নাই। কোন তত্ত্বজ্ঞান বা শুভকর্মের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের বৈশিষ্ট্য হইল নিষ্কামতা। মধুর রসে গোপিকাগণ, বাৎসল্যরসে জননীগণ ও গাভীগণ, সখ্যরসে সুবলাদি সখাগণ ও গিরিগোবর্ধন, দাস্য রূপে রক্তক, পত্রক ও নাগপত্নীগণ, শান্তরসে কালীয় নাগ, যমলার্জুন ও তরুগুল্মলতা আমাকে একান্তভাবে আপন করিয়াছে।

অগ্রজ বলরামকে ও আমাকে লইয়া অক্রুর মথুরায় চলিয়া গেলেন। আমার ব্রজজন সকলে আমার বিরহরূপ দুঃসহ ব্যাধিতে কিরূপ মুহ্যমান হইয়াছিল তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। বিয়োগ-বেদনায় মৃত্যুতুল্য অবস্থায় পৌঁছিয়াও তাহারা আমা-ভিন্ন অন্য কোন শোককর দৃশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। ইহার হেতু হইল রাগাত্মিকা ভক্তি বা আমার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম।

"বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগঃ" এই প্রগাঢ় প্রেমেরই নাম মহাভাব। গোপীরা সকলে ছিল মহাভাবময়ী।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব, তুমি বদ্ধ ও মুক্তের পার্থক্য জানিতে চাহিয়াছ। বন্ধন মোক্ষ এই দুইটি ভাব গুণগত, বস্তুত কিছুই নহে। গুণ অর্থ সত্ত্বাদি ত্রিগুণ, উহা মায়ার বিকৃতি। আমি মায়াধীশ। সুতরাং আমার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। জীব আমার অংশ। অংশস্বরূপ জীবের অবিদ্যা দ্বারা হয় বন্ধন ও বিদ্যা দ্বারা হয় মোক্ষ। এই উভয়ের বৈলক্ষণ্য তোমার নিকট বলিতেছি। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষে দুইটি পাখী বাস করে। একটি বৃক্ষের ফল খায় আর একটি কিছুই খায় না, অথচ বাঁচিয়া থাকে, খুব বলবান্–'নিরান্নোঽপি বলেন ভূয়ান।' ইহারা একে অন্যের সখা। ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অনেক। উভয়েই সদ্-রূপ ও চিদ-রূপ। উভয়েরই সত্তা ও চেতনা আছে কেবল আনন্দাংশে বিভিন্নতা। যে পাখীটা ফল খায়, সে নিত্যবদ্ধ, তার আনন্দ মায়াবৃত। যে পাখীটা ফল খায় না, সে নিত্যমুক্ত, আনন্দপূর্ণ নিত্যানন্দে চিরতৃপ্ত। বিদ্যাযুক্ত, নিত্যমুক্ত, আর অবিদ্যাযুক্ত নিত্যবদ্ধ।

"যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো।,
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ।।"

এই অশ্বত্থ বৃক্ষটির কথা কঠ-শ্রুতিতে (কঠ, ২/৩/১) আছে– 'ঊর্ধ্বমূলো ঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।'

এই বৃক্ষটির কথা গীতাতেও আছে–

"ঊর্ধ্বমূলমধঃ শাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।" ১৫/১

এই বৃক্ষ বলিতে সংসার-বৃক্ষ দেহ-বৃক্ষ দুই-ই বলা যায়। বৃক্ষের মূল ঊর্ধ্বদিকে, শাখা-প্রশাখা, নীচের দিকে। দেহবৃক্ষের যে মূল উপরে, শাখা নিম্নে, ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়। মস্তকে সহস্রদলে পরমাত্মার অধিষ্ঠান। তিনি দেহের যাবতীয় কর্মের মূল উৎস। বিজ্ঞান মতেও মস্তিষ্কই দেহকে চালিত করে। যদিও আমরা দেখিতে পাই না, তথাপি সংসারবৃক্ষ ও দেহবৃক্ষ একই রূপ। বেদ এই বৃক্ষের পরিচয় দেয়। পত্রের দ্বারা বৃক্ষের পরিচয়, এইজন্য বেদ এই বৃক্ষকে পত্ররূপে বেষ্টন করিয়াছে।

মানুষের দেহ দৈবাধীন। পূর্ব কর্মের অর্জিত ফলকে দৈব বলে। এই দৈবাধীন দেহে বাস করিয়া অজ্ঞান ব্যক্তি 'আমি কর্তা' মনে করে। এই জন্য সে দেহে বদ্ধ থাকে। বিদ্বান্ ব্যক্তি দেহদ্বারা শয়ন-গমন-ভোজন-শ্রবণাদি কার্য করিয়াও অবিদ্বানের মত বদ্ধ হয় না। আকাশ, বাতাস, সূর্যের মত নির্লিপ্ত থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তি, মন ও বুদ্ধির বৃত্তি সংকল্প-বিকল্প হইতে ঊর্ধ্বে থাকেন। এইজন্য দেহস্থ হইয়াও তিনি দেহের দোষগুণ হইতে মুক্ত। তিনি দুর্জনের হিংসায় রুষ্ট নহেন, সুজনের পূজায়ও তুষ্ট নহেন। তিনি প্রশংসাকারীর স্তব করেন না, নিন্দাকারীরও নিন্দা করেন না।

"ন স্তবীত ন নিন্দেত কুর্বতঃ সাধ্বসাধু বা।"

জ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ারাম নহেন, আত্মারাম। আত্মানন্দে আপ্লুত থাকেন। তিনি ভালমন্দ কিছু করেন না, বলেন না, চিন্তা করেন না। মনে হয় জড়বৎ। অনেক লোক আছেন বেদজ্ঞ। বেদ পড়িয়াছেন অথচ বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের ধ্যান করেন না। তাঁহারা বন্ধ্যা গাভীর স্তনের মত বেদবিদ্যা বহন করেন। তাঁহাদের সকল শ্রমই পণ্ডশ্রম।

উদ্ধব, যে ব্যক্তি দুগ্ধহীনা গাভী, সতীত্বহীনা পত্নী, অসৎ পুত্র, সংকার্যে ব্যয়হীন ধন ও ভগবৎ-কথাহীন বাক্য লইয়া জীবন কাটায়, সেই বদ্ধজীবের প্রাপ্য নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ।

আমার দুইটি পবিত্র কার্য। একটি সৃষ্টিলীলা, আর একটি অবতাররূপে মধুর খেলা। যে কথায় আমার এই দুই পবিত্র কার্যের কোন প্রকাশ নাই সে কথা নিষ্ফল। জ্ঞানী ব্যক্তি সেই কথা মুখে, কানে বা হৃদয়ে স্থান দেন না। ইহা স্থিরভাবে জানিয়া তোমার নির্মল মন আমাকেই সমর্পণ পূর্বক উপরত হও।

"উপারমতে বিরজং মনো ময্যর্প্য সর্বগে।"

উদ্ধব, আমাতে নিশ্চলা-ভক্তি লাভের উপায় বলি। আমার মঙ্গলকারী কথা শ্রদ্ধালু হইয়া শুন, নিরন্তর আমার জন্মকর্মের কথা কীর্তন ও অনুস্মরণ কর।

আমার আশ্রয়ে থাকিয়া আমার উদ্দেশ্য, ধর্ম, অর্থ, কামের ব্যবহার করিবে। ইহা হইতেই ভক্তি লাভ হইবে। ভক্তসঙ্গ হইতে জাত ভক্তি দ্বারা যে ব্যক্তি আমাকে ধ্যান করে, সে অনায়াসে আমার পরমপদ লাভ করে। ❑

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

[অ : ১৮, শ্লোক : ৩০]

অনুবাদ ঃ হে পার্থ, প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ, কর্তব্য (বিহিত কর্ম) ও অকর্তব্য (নিষিদ্ধ কর্ম), ভয়ের কারণ–সংসারপ্রসূ অজ্ঞান এবং অভয়ের কারণ–সংসারনাশক জ্ঞান, সহেতুক বন্ধন এবং সহেতুক মোক্ষ–এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির দ্বারা জানা যায়, তাহা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। *[অ : ১৮, শ্লোক : ৩০]*

সুস্থ থাকার জন্য রাজযোগ মেডিটেশন

বি. কে. শ্রীকান্ত কুমার মণ্ডল

আজ মানুষ নানা মানসিক দুশ্চিন্তা, ভয়, হতাশা, নিদ্রাহীনতা এবং অনেক রোগ-শোকে জর্জরিত। এর কারণ হলো জীবনে মানবীয় গুণাবলির পতন এবং শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব। অস্থিরতা, চঞ্চলতা, উদ্বিগ্নতা এবং অধৈর্য মানুষকে তার গন্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেয় না। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধাগ্রস্ত হতে হয়। কোন কাজে স্থায়িভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় না, ফলে কর্মে সফলতা আসে না। অস্থির এবং চঞ্চলতার কারণে মানুষের মধ্যে ভয়, ক্রোধ এবং সন্দেহ প্রবণতা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। আজ মানুষ দৃঢ় বা প্রত্যয়ী হতে পারছে না। দুশ্চিন্তা, অবসাদগ্রস্ত, সিদ্ধান্তহীনতা, অখুশি, অসন্তুষ্টতা এবং পেটের নানা সমস্যার কারণ হলো অস্থিরতা, চঞ্চলতা, উদ্বিগ্নতা ও অধৈর্য। এটি এক ধরনের মানসিক সমস্যা। শারীরিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যেমন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয় তেমনি মানসিক সমস্যা সমাধানের জন্যও নানা রকম পদ্ধতির মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো নিয়মিত রাজযোগ মেডিটেশনের অভ্যাস।

রাজযোগ মেডিটেশনের উপকারিতা : রাজযোগ মানুষের ভিতরে সুপ্ত মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পরস্পরের মধ্যে শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা এবং দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করে। সাথে সাথে শরীরের মধ্যে নাড়ির স্পন্দন কম হতে থাকে, ফলে রক্তচাপ, হার্টবিট, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদির কাজ সুচারুরূপে পরিচালিত হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ু শান্ত এবং স্বাভাবিক থাকায় মনোজৈবিক পরিবর্তন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

রাজযোগ মানুষের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং দেহ বিকারের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়। মানবীয় মূল্যবোধের জাগরণ ঘটে এবং ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। উদাসীনতা, ক্রোধ, ভয়, বিরক্তভাব এবং দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে মনের মধ্যে উৎফুল্লতা এনে দেয়। প্রত্যেকটি কর্মে সফলতা আসে। টেনশন থেকে সৃষ্ট শারীরিক কষ্ট যেমন মাথা ধরা, অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, চর্মরোগ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা রাজযোগ মানুষের মনে প্রকৃত শান্তির অনুভব করায়, আত্মানুভূতি এবং পরমাত্মানুভূতি জাগিয়ে তোলে, মনের একাগ্রতা লাভ করা যায়, সর্বদা খুশি এবং আনন্দে ভরপুর থাকা যায়। সর্বোপরি রাজযোগ মেডিটেশন মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটায়, নিজের প্রতি বাড়ে আস্থা, বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা এবং মন শান্ত, উদার ও বিশাল হয়, ফলে স্থিতিশক্তি দিন-দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সবচেয়ে বড় কথা রাজযোগ মানুষের মনে প্রকৃত শান্তির অনুভব করায়, আত্মানুভূতি এবং পরমাত্মানুভূতি জাগিয়ে তোলে, মনের একাগ্রতা লাভ করা যায়, সর্বদা খুশি এবং আনন্দে ভরপুর থাকা যায়।

রাজযোগ মেডিটেশন করার জন্য প্রাথমিকভাবে যে বিষয়গুলো জানা একান্ত প্রয়োজন এবং এর প্রক্রিয়া নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) আমার ভেতরে আমিকে খোঁজা অর্থাৎ আমি এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ অবিনাশী চৈতন্য শক্তি আত্মা। আত্মার অবস্থান এই দেহের ভ্রুযুগলের মধ্যখানে। আত্মার ধর্ম শান্তি। আত্মার সূক্ষ্মশক্তি হলো মন-বুদ্ধি এবং সংস্কার। সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা, জ্ঞান এবং শক্তি এই সাতটি আত্মার মৌলিক ও মুখ্য গুণ। রাজযোগের দ্বারাই এই সুপ্ত মূল্যবোধগুলোর জাগরণ ঘটানো সম্ভব। আত্মাকে জানার সাথে সাথে এর স্বরূপ ও শক্তিকে অনুভব করাই হলো মুখ্য বিষয়। কেননা আত্মানুভূতি হলেই পরমাত্মানুভূতি হয়।

২) আত্মানুভূতির পরেই আসে পরমাত্মানুভূতির পর্ব। পরমাত্মা আত্মার মতই নিরাকার, প্রকাশময় এবং জ্যোতির্বিন্দু স্বরূপ। আত্মা দেহ এবং দুনিয়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয় কিন্তু পরমাত্মা দেহ এবং দুনিয়ার সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত। তিনি অজর, অমর, অবিনাশী, অভুক্তা এবং জন্ম-মৃত্যু রহিত। তিনি ব্রহ্মলোক নিবাসী, সর্বশক্তিমান, পরম পবিত্র, জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর এবং আনন্দের সাগর। রাজযোগ মেডিটেশনের মাধ্যমে মনের একাগ্রতা আনার জন্য পরমাত্মার নিবাসস্থল এবং তাঁর জ্ঞান-গুণ-শক্তি ও মহিমা সম্পর্কে অবশ্যই স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। সাথে সাথে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান সম্পর্কেও জানতে হবে। বর্তমান সময়ের আহবান এবং পরিস্থিতিকে বুদ্ধিমত্তার সাথে উপলব্ধি করা খুবই জরুরি। মহাজ্ঞানী তাঁকেই বলা হবে যিনি ইতোমধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মা সম্পর্কে গভীরভাবে জেনেছেন এবং অনুভব করেছেন।

৩) উপরিউক্ত জ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জেনে দুই ভ্রুযুগলে নিজেকে আত্মা অনুভব করে ব্রহ্মলোকে বা পরমধামে বা নির্বাণধামে নিরাকার পরমাত্মার সাথে যোগযুক্ত হলেই তাকে রাজযোগ মেডিটেশন বলা যাবে।

৪) পরিশেষে যে বিষয়টি একান্তভাবে জানা প্রয়োজন তা হলো- আমাদের ভাবনা ও চিন্তাধারাকে ইতিবাচক করা। প্রতিটি বিষয়কে শুদ্ধ সংকল্পের দৃষ্টিতে দেখা। মনে রাখা প্রয়োজন, আমরা যে রঙের চশমা চোখে পরিধান করবো পৃথিবীকে সেই রঙেই আমরা দেখবো অর্থাৎ আমার অভ্যন্তরীণ ভাবনা ও চিন্তা যেমন হবে সংসার ও পৃথিবীর মানুষকে আমি সেভাবেই দেখতে শিখবো। তাই রাজযোগ মেডিটেশনের দ্বারা মনের ভেতর শুদ্ধ ভাবনা-চিন্তার উন্মেষ ঘটিয়ে নিজের মধ্যে, সমাজে, দেশে ও বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা এবং সুস্থ জীবন ব্যবস্থা উপহার দেওয়া প্রতিটি মানুষের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। রাজযোগ মেডিটেশনের দ্বারা সুস্থ ও প্রশান্তিময় জীবন গড়ার জন্য এবিষয়ে আরো গভীর ও বিস্তারিতভাবে জানতে এই www.bkwsu.org, www.brahmakumaris.com ওয়েব সাইট দুটি সকলকে সহযোগিতা করবে। ❑

ক্রিয়াযোগের অমৃত ধারা

কেয়া মিত্র

"ক্রিয়াযোগের অমৃত ধারা", যে ধারার উৎস দ্রোণোগিরি পর্বতের একটি গুহায় ১৮৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে - যে ক্রিয়াগঙ্গা যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবা ভগীরথের মতন নিয়ে এলেন ধরাধামে, বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে। বাবাজী মহারাজ ও লাহিড়ী বাবার সেই অমৃত ধারা আজও তাঁদের অমৃত সন্তানগণ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ও বিতরণ করে চলেছেন তাঁদের, যারা সেই অমৃতকল্পের সন্ধান করছেন। শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের পরবর্তীকালে, এখন পর্যন্ত অসংখ্য যোগী ও যোগাচার্যগণ এই কাজে ব্রতী রয়েছেন, তাঁদের একটি সূত্রে মালায় গাঁথার চেষ্টা করেছেন কেয়া মিত্র। এর মাঝে কতিপয় যোগাচার্যগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করা হল।

সাঁইবাবা

আমেদাবাদ জেলার মহাযোগী সিরডি সাঁইবাবা সম্ভবত ১৮৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত কাউকেও প্রকাশ করেননি। ফলে সঠিকভাবে তিনি কোন্ পরিবারে কোন্ পিতামাতার কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তিনি যেমন তাঁর পিতামাতার নাম কারও কাছে প্রকাশ করেননি, তেমনি তিনি তাঁর গুরুদেবের নামও কোথাও প্রকাশ করেননি। তিনি তাঁর গুরুদেবকে ডেনকুশ নামে আখ্যা দিতেন। আবার যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণের দিনপঞ্জিতে পাওয়া যায় যে তিনি সাঁইবাবাকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেছিলেন। ঐ সময় ভারতবর্ষে সাঁইবাবা নামে আর কাকেও পাওয়া যায় না।

সাঁইবাবার নিকট হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান সর্বধর্মাবলম্বী, সকল শ্রেণির লোক ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সমানভাবেই সমাদর লাভ করতেন। ফলে সাঁইবাবার জীবন দর্শনের সাথে যোগিরাজের আদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যোগিরাজের নিকটস্থ হিন্দু মুসলমান খ্রিষ্টান সকল শ্রেণির মানুষ এই ক্রিয়াযোগের দীক্ষা পেয়েছিলেন। সাঁইবাবা বলতেন, 'সব কা মালিক এক'। যোগিরাজ বলতেন, 'আমা হতে সমগ্র জগতের প্রকাশ। হম ছোড়া কোই নেহি'। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায় এই সাঁইবাবার কথাই যোগিরাজের দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ করা আছে।

১৮৭২ সালে তিনি শিরিডিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সময় প্রথমে এক নিম গাছের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তিনি শিরিডির মসজিদে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় কিছু লোক এসে এক জায়গায় বসে ধর্মতত্ত্ব কথা আলোচনা করতেন। সাঁইবাবাও তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতেন। একদিন নানা বিষয় নিয়ে ধর্মতত্ত্ব কথা আলোচনা হচ্ছে। নবীন সাধক সাঁইবাবা তাঁদের সঙ্গে নানা তত্ত্বকথা আলোচনা করছেন। ক্রমে রাত গভীর হওয়ায় লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো প্রায় নিভে যায়। নবীন সাধক সাঁইবাবা একটু জল নিয়ে লণ্ঠনে দিলেন তেলের পরিবর্তে। লণ্ঠন পূর্বেকার মত জ্বলে উঠল। নবীন সাধকের এইরকম শক্তি গ্রামের লোকেদের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল।

নবীন সাধক সর্বদা বসে থাকেন আত্মসমাহিতভাবে। তাঁর সামনে একটি ধূনি সদাই জ্বলছে। সাঁইবাবার অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ হবার পর থেকে নানাভাবে তাপিত আর্ত মানুষ তাঁর কাছে ভিড় করতে থাকেন। তিনি ত্রাতা হিসেবে সবার দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করতেন। নানাশ্রেণির মানুষ তাঁর নিকট ভিড় করতে থাকেন। সেই ছিন্নবাস ফকির এখন সবার হৃদয়ের ধন সর্ববরেণ্য সাঁইবাবা। লোকমান্য গঙ্গাধর তিলকও তাঁকে দর্শনের জন্য আসতেন।

সারাদিন দর্শনার্থীর ভিড়ে নানা উপঢৌকনের পাহাড় জমতে থাকে সাঁইবাবার চারিপাশে। তিনি সেই সব জিনিসের দিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে অকাতরে সমস্ত ধনসম্পদ আহার্য বিলিয়ে দেন দীন দরিদ্রদের। তারপর মসজিদ থেকে বেরিয়ে নিজের জন্য ভিক্ষা করেন দুটি রুটি ও তরকারি কোন গৃহস্থের বাড়ি হতে। সবকিছুর মধ্যে থেকেও তিনি ত্যাগের মহিমায় নিজেই মহিমান্বিত থাকেন। বড় বড় প্রতিপত্তি প্রাপ্ত মানুষ তাঁর আশ্রয়ে এসে ভুলে যেতেন তাঁদের যশ প্রতিপত্তি। তাঁর তখন সাঁইবাবার চরণে একান্ত সেবক।

একজন ভদ্রলোক তাঁর কাছে আসলেন ব্রহ্মদর্শনের জন্য। সাঁইবাবার নিকট মনের আকুতি নিবেদন করলেন। সাঁইবাবা বললেন, ঠিক আছে দর্শন করাব। ইতোমধ্যে সাঁইবাবা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করে চলেছেন সে ব্যক্তিও ক্রমশ অধীর হচ্ছেন যে ব্রহ্মদর্শন করেই তিনি ফিরে যাবেন বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। ইতোমধ্যে সাঁইবাবা তাঁর প্রয়োজন বলে পাঁচ টাকা একজনের কাছে আনতে পাঠালেন। তিনি নেই আরেকজনের কাছে পাঠালেন। তিনিও নেই। সেই ভদ্রলোক কিন্তু নিজের কাছে থাকা সত্ত্বেও পাঁচটি টাকা সাঁইবাবাকে দিলেন না।

তখন সাঁইবাবা বললেন, সবাই শোন আমি পাঁচ টাকা চাই, এই পাঁচ টাকা মানে সোনা বা রুপোর টাকা নয়, পাঁচটি বস্তু। সেই পাঁচটি বস্তু চিরতরের জন্য গুরুর কাছে সমর্পণ করতে হবে। এই পাঁচটি বস্তু হচ্ছে পঞ্চপ্রাণ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আর অহংবোধ।

তখন সাঁইবাবা বললেন, সবাই শোন আমি পাঁচ টাকা চাই, এই পাঁচ টাকা মানে সোনা বা রুপোর টাকা নয়, পাঁচটি বস্তু। সেই পাঁচটি বস্তু চিরতরের জন্য গুরুর কাছে সমর্পণ করতে হবে। এই পাঁচটি বস্তু হচ্ছে পঞ্চপ্রাণ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আর অহংবোধ। তোমাদের যদি জাগতিক বস্তুতে কোন আকর্ষণ থাকে তাহলে ব্রহ্মলাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নয়।

লোকটি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে যাবার পর সাঁইবাবা সকলকে বললেন, দেখ ওর পকেটে আড়াইশ টাকা ছিল অথচ তা থেকে পাঁট টাকা বার করতে পারল না। এদিকে আবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চায়। তাঁর কাছে যে সব ভক্তবৃন্দ আসতেন তাঁদের তিনি শিক্ষা দিতেন কিভাবে সমদর্শিতা লাভ করা যায়। ভ্রাতৃত্ব বোধ আসে আর সহনশীলতা লাভ হয়। মাঝে মধ্যে ভক্তদের মধ্যে যদি কোন বিরূপ চিন্তা কাজ করত, তিনি তৎক্ষণাৎ মনের ভাব বুঝে তাদের শাসন করতেন। তারা সাবধান হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন ভগবান কি শুধু মন্দিরের মধ্যে বিরাজমান, তিনি বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে রয়েছেন। তাঁর সৃষ্ট সুন্দর জিনিসে মোহিত হয়ে আমাদের বুঝতে হবে যে সৃষ্টিকর্তা তাহলে কত সুন্দর। তাই সৌন্দর্যের পিছনে কি রহস্য আছে সেটাই আমাদের ধরতে

হবে। বাইরের সৌন্দর্যের মধ্যে থাকলে সেই রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

তিনি তাঁর ভক্তদের সব সময় বলতেন দেখ কোন ভিক্ষুক যদি তোমার কাছে অর্থ বা খাবার চায় তবে তুমি যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করবে, তাদের উপর বিরক্ত বা কুপিত কখনও হবে না।

১৯১৯ সালের ১৮ই অক্টোবর সাঁইবাবা চৌদ্দদিন রোগ শয্যার শায়িত। এক ব্রাহ্মণ তাঁর আদেশ মত রামবিজয় চম্পু পাঠ করছেন। তিনি বলতে লাগলেন এই পাঠে মৃত্যুঞ্জয় শিব তুষ্ট হবেন আবার শিরডির নিকটেই এক ফকির বাস করতেন তাঁর নিকট খবর পাঠালেন এই দেহে আল্লা যে আলো জ্বালিয়েছেন তা এবার নিভিয়ে দেবেন।

এবার তিনি ভক্তদের নির্দেশ দিলেন যে আমার এবার ডাক এসেছে আমি যাচ্ছি। ভক্ত বুটি যে মন্দির করেছে সেই মন্দিরে এই দেহের সমাধি দেবে। বেলা প্রায় তিনটের সময় সাঁইবাবা তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে স্বধামে চলে গেলেন।

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী

↓

সাঁইবাবা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আজ সমগ্র ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে একটি পরিচিত নাম। তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই ব্রাহ্মধর্মের অনুশাসনের মধ্যে বড় হয়েছেন। ব্রাহ্মধর্মের উপাস্য হলেন নিরাকার ব্রহ্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মের একজন প্রবক্তা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বোলপুরে প্রথম শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তখন, তখনকার রক্ষণশীল সমাজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে পড়াবার জন্য তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠাতেন না। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য আসেন যোগাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল। যোগিরাজের আদর্শই ছিল 'সর্বদা স্ব উপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিবে।' সেই আদর্শ মাথায় রেখে যোগীরাজের সর্বকনিষ্ঠ শিষ্য যিনি মাত্র ১৬ বছর বয়সে যোগিরাজের নিকট ক্রিয়াদীক্ষা প্রাপ্ত হয়ে অল্প দিনের মধ্যে যোগাচার্য পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

যোগাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল ধীরে ধীরে শান্তিনিকেতনের শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ স্যানালের পাণ্ডিত্য, জ্ঞান এবং সুচারুভাবে বিদ্যালয় পরিচালনের ক্ষমতা দেখে আশ্রমের পরিচালনার সকল দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। সেই সময়কার রক্ষণশীল পরিবার যখন দেখলেন যে একজন নিষ্ঠাবান সৎ ব্রাহ্মণের হাতে আশ্রমের পরিচালনের ভার, তখন তারা তাদের সন্তানদের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পাঠাতে আরম্ভ করেন। সেই অর্থে শান্তিনিকেতন আশ্রমের জনপ্রিয়তা আসা সম্ভব হয় যোগাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল মহাশয়ের কর্মদক্ষতার গুণে। ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল বহু বছর শান্তিনিকেতন আশ্রমে দায়িত্বের সঙ্গে শিক্ষকতা এবং পরিচালনা করেন।

দুই মহারথী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর যোগাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ করতেন তখন ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল ক্রিয়াযোগের আদর্শ ও ভাবধারার কথাই আলোচনা করতেন। সেই সমস্ত আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতেন, ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের ও কবিতার প্রকৃত অর্থ গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে কবিগুরুর চেতনার অন্তস্তলে রয়েছে ক্রিয়াযোগের চেতনা।

পরমহংস হরিহরানন্দ মহারাজ তাঁর বিভিন্ন সভায় ক্রিয়ার বিষয় আলোচনার সময় কবি গুরুর বিভিন্ন কবিতা বা গান থেকে উপমা দিয়ে সহজে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেন। হরিহরানন্দ মহারাজ একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র সংগীতকেই প্রাধান্য দিতেন। পরমহংস হরিহরানন্দজী বিশ্বকবির গানের প্রতি শুধু অনুরক্তই ছিলেন না, তিনি বিশ্বকবির গানের ও কবিতার মধ্যে যে ক্রিয়াযোগের সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম অর্থ অন্তর্নিহিত রয়েছে সেটা তিনি সর্বদা সাধনজগতে তুলে ধরতেন।

কবিগুরু নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বকবির মর্যাদায় ভূষিত হয়েও তিনি ক্রিয়াযোগীদের অন্তরের সাথে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে পরমহংস যোগানন্দ ও স্বামী সত্যানন্দ গিরিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই সময় এই যোগীদ্বয় বলেছিলেন বিশ্বকবির এই আশ্রমটি ভগবদ্ প্রেমের উদ্যান।

ভূপেন্দ্রনাথ স্যানালের কর্মক্ষমতার গুণে শান্তিনিকেতন আশ্রম ধীরে ধীরে একটি সুন্দর সর্বাঙ্গসুন্দর বিদ্যালয় এবং আশ্রমে পরিণত হয়। বহুদিন একভাবে শিক্ষকতা করার পর যোগাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ স্যানালের মন ক্রমশ অন্তঃমুখী অবস্থা লাভ করায় তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে পুরীতে এসে আশ্রম স্থাপনা করে ক্রিয়াযোগের প্রচারে নিজেকে ডুবিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু থেমে যাননি। তিনি শান্তিনিকেতনকে আরও পল্লবিত করার জন্য নানাভাবে কর্ম করে যেতে লাগলেন, ধীরে ধীরে কবিগুরুর শান্তিনিকেতন বিশ্বের দরবারে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হল। এইবার রবীন্দ্রনাথ থামলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছে ৭৮ বছর। শরীরের মধ্যে বাসা বেঁধেছে নানা রোগ। এতদিনের কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে যে আশ্রম স্থাপনা করেছেন সেটি এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু মনের মধ্যে তো তিনি অনাবিল শান্তি লাভ করছেন না।

এতবছর পর তাঁর মনে হল ক্রিয়াযোগের উপদেশের কথা। তিনি তাঁর পুরানো দিনের সখা বন্ধু ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল মহাশয়কে আহ্বান করলেন তাঁকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দানের জন্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে যোগাচার্য ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল তাঁর এক ক্রিয়াযোগী শিষ্য বুদ্ধ বোসকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসে হাজির হলেন। কবিগুরুর আগ্রহে তিনি বুঝলেন যে হ্যাঁ সত্যসত্যই রবীন্দ্রনাথ ক্রিয়াযোগে দীক্ষা নিতে আগ্রহী। ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল আক্ষেপের সাথে বলেন তরুণ বয়সে যদি এই ক্রিয়াযোগ সাধনে আগ্রহী হতে তাহলে তোমাকে এত রোগগ্রস্ত হতে হোত না। তুমি এতদিনে অনাবিল আনন্দ নিজেই অনুভব করতে পারতে। এখন তোমাকে এই শরীর নিয়েই কিন্তু নিয়মিত দুইবেলা ক্রিয়া অনুশীলন অবশ্যই করতে হবে। গুরুদেব যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী এই বিষয়ে কিছু বিধি নিষেধ এবং কিছু অঙ্গীকার করিয়ে নেবার বিধি দিয়েছেন। যিনি সেই সমস্ত বিধি নিষেধ মেনে নেবার অঙ্গীকার করবেন তিনিই ক্রিয়া পেতে সক্ষম হবেন।

রবীন্দ্রনাথ সবকিছুতেই সহমত হলেন এবং তিনি যে সত্যসত্যই ক্রিয়াযোগ পেতে আগ্রহী সে কথা ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল মহাশয়কে ভালভাবে বোঝালেন। তারপর যোগাচার্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ক্রিয়া দীক্ষায় দীক্ষিত করলেন। তারপর ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল ক্রিয়াযোগের সকল শক্তি সঞ্চার করেন। গুহ্যতত্ত্ব কবিগুরুকে বুঝিয়ে দিলেন। এবার বুদ্ধ বসু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণায়ামের পদ্ধতি ও মুডসমূহ অনুশীলন করে দেখিয়ে দিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ক্রিয়াযোগে দীক্ষা গ্রহণ করার পর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি অনুশীলন করতেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ব্রাহ্মধর্মে থাকায় তাঁর চিন্তাধারায় কিছুটা সুবিধা তিনি লাভ করেছিলেন। এই ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত হবার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র আর দু বছর বেঁচেছিলেন। ফলে তিনি নিয়মিত অভ্যাস করলেও ক্রিয়ার স্তরগুলি লাভ করতে পারেননি। যোগাচার্য আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে বিশ্বকবি যদি আর কয়েক বছর পূর্বে সুস্থ সবল শরীরে এই ক্রিয়াযোগ গ্রহণ করতেন তাহলে তিনি এক অনন্য কৃতীর অধিকারী হতে পারতেন।

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী
↓
শ্রীমৎ ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল
↓
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোগাচার্য বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু প্রথম জীবনে ভগবতী চরণ ঘোষের নিকট ক্রিয়াযোগের প্রাথমিকভাবে শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে পরমহংস যোগানন্দের নিকট ক্রিয়াযোগে দীক্ষা লাভ করেছিলেন। বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হতে তিনি ক্রিয়াযোগের বিশেষ মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

বিষ্ণুচরণ ঘোষ মহাশয়ের কন্যার সহিত বুদ্ধদেব বোস পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবনে প্রবেশ করেন।

বুদ্ধদেব বোস ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল মহাশয়ের নিকটে ক্রিয়াযোগের শিক্ষালাভ করেছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন তাঁর বাল্য সহচর ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল মহাশয়কে ক্রিয়াযোগের শিক্ষার অভিলাষে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেন, তখন ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল মহাশয় সুদর্শন, ক্রিয়াযোগী যুবক বুদ্ধদেব বসুকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - স্যানাল মহাশয়ের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে ৭৩ বছর বয়সে তাঁর কাছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা লাভ করেন। স্যানাল মহাশয়, বৈদিক পদ্ধতি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের আত্মার শুদ্ধিকরণ ঘটিয়ে - কবির অন্তরে গুরুশক্তির শক্তিপাত করেন। তারপর ক্রিয়াযোগের অন্যান্য বাহ্যিক পদ্ধতিগুলি বুদ্ধদেব বসু সযত্নে কবিগুরুকে দেখিয়ে দেন। বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ও ছিলেন একজন উন্নত ক্রিয়াযোগী।

বুদ্ধদেব বসু যোগাচার্য্য হবার পর লণ্ডন ও আমেরিকার বহু স্থানে ক্রিয়াযোগের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন।

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী
যুক্তেশ্বর গিরি — ভূপেন্দ্রনাথ স্যানাল
যোগানন্দ
যোগাচার্য বুদ্ধদেব বসু

কাজী নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে কিছু জানেন না এমন বাঙালি খুব কমই আছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে তাঁর যে সমস্ত কবিতা ও গান রচিত হয়েছে - তা আজ জাতীয় সম্পদ। সেই সময় তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

কাজী নজরুল ইসলামের অন্যতম পরিচয় হল তিনি একজন যোগী পুরুষ। তিনি লালগোলার হেডমাস্টার মহাযোগী শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের নিকট হতে যোগ দীক্ষা লাভ করেছিলেন। শ্রী বরদাচরণ মজুমদারের রচিত 'পথ হারার পথ' নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে। এই বইটিতে নজরুল ভূমিকায় গুরুদেব বরদাচরণ মজুমদার সম্বন্ধে লিখেছিলেন "তাঁহার যা দীপশিক্ষা আমায় পথ দেখাইয়া অমৃত সাগরের তীরে জ্যোতিঃলোকের দ্বারে লইয়া আসিয়াছে, সে দীপশিখার প্রাণ এই গ্রন্থ। বহু পথ হারা সাধক এই সাধনার দীপশিখার অনুবর্তী হইয়া পথ পাইয়াছেন। আজ তাঁরা জীবন্মুক্ত হইয়া দুঃখ শোকের অতীত অবস্থায় স্থিত।

সারা জীবন ধরিয়া বহু সাধু সন্ন্যাসী যোগী, ফকির, দরবেশ খুঁজিয়া বেড়াইয়া যাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল আলোক পাইল, তিনি আমাদের মত গৃহী। এই গৃহে বাতায়ন দিয়াই আসিয়াছে ব্রহ্মজ্যোতি। তাঁহার সাধনার ইঙ্গিত এই পথ হারার পথে রহিয়াছে।"

কাজী নজরুল বরদা চরণের নির্দেশে ক্রিয়াযোগের সাধনা করতেন। কাজী নজরুলের ছোট ছেলে বুলবুল ছোট বয়সে মারা যাওয়ায় কাজী নজরুল আদরের সন্তানের বিরহে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। কিভাবে তিনি তাঁর আদরের সন্তানের আর একবার দেখা পাবেন সেই চিন্তায় তিনি মানসিক ভাবে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। এইসময় নজরুলের কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের কাছে নিয়ে যান। কথিত আছে সেই সময় বরদাচরণ বলেন যে ঠিক আছে, বুলবুলের স্থূলদেহ মাটির তলায় পচে গেলেও তাকে নিয়ে আসব, কিন্তু কেউ সেই সময় আমাকে বা বুলবুলকে স্পর্শ করতে পারবে না। প্রয়োজনে সেইসময় নজরুলকে দড়ি দিয়ে আটকিয়ে রাখতে হবে। আবার যখন বুলবুল চলে যাবে বেশ কিছুটা উপরে উঠবে অর্থাৎ নাগালের বাইরে সেই সময় নজরুলকে বাঁধন মুক্ত করতে হবে।

সেইমত ঠিক করে যোগীবর বরদাচরণ মজুমদার ধ্যানমগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল উপর থেকে আস্তে আস্তে বুলবুলের সজীব দেহ নিচে নেমে এল। ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক খেলা করল, সেই সময় ঘরে উপস্থিত মানুষ নজরুলকে শক্তভাবে দড়ির সাহায্যে বেঁধে রাখতে বাধ্য হয়, কারণ নজরুল বুলবুলকে ধরার জন্য সচেষ্ট হন। এইবার কিছুক্ষণ ঘরে থাকার পর বুলবুল আবার পাখির মত উপর দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। যখন হাতের নাগালের বাইরে সেই সময় নজরুলকে বাঁধন মুক্ত করা হয়। নজরুল সেই সময় ছুটে গিয়ে বুলবুলকে ধরতে যান। কিন্তু বিফল হন। বহুদিন মৌন থাকার পর এই সময় তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে

"শূন্য এ বুকে পাখি মোর ফিরে আয়
ফিরে আয়।"

সেই সময়কার মত কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর মানসিক অবসাদ থেকে মুক্ত হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবন আরম্ভ করেন।

যোগীবর বরদাচরণ মজুমদার এই সময় আঘাতের পর আবার পাল্টা আঘাত দিয়ে নজরুলকে শক্ত করে তোলেন। যোগীদের পক্ষেই সম্ভব মাটির তলায় পচে যাওয়া দেহকে আবার সজীব করে তোলা।

মহাযোগী বরদাচরণ স্কুলে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করতেন। নজরুল গৃহিণী প্রমিলা বরদাচরণ মজুমদারের নিকট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাতেন ও নির্দেশ মত ওষুধ খেতেন। প্রমিলা ও নজরুল বরদাচরণ মজুমদারের নিকট হতে যোগ দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেইমত সাধনাও করতেন। কাজী নজরুলের শাশুড়ি মাতাও মহাযোগী বরদাচরণ মজুমদারের একান্ত ভক্ত ছিলেন।

পুত্র বুলবুলকে দেখতে পেয়ে কবিবর আবার আগের মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে থাকেন, আর মন প্রাণ ঢেলে গুরুদেব বরদাচরণ মজুমদারের নির্দেশ মত সাধনা করতে থাকেন। পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে আবার অপ্রকৃতিস্থতা দেখা দেয়। সম্ভবত বেশি পরিমাণ সাধনার ফল স্বরূপ এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তবে এই ব্যাধি সাধারণ মানবের মত পাগল অবস্থা নয়, এইরূপ অবস্থা যোগেরই একটা অবস্থা। কারণ শাস্ত্রে দেখা যায় ভগবৎ শক্তির প্রাবল্যে সাধক কোন কোন সময় উন্মাদবৎ অবস্থাও প্রাপ্ত হন।

সত্য সত্যই তিনি কোন্ অবস্থায় ছিলেন আজ আর জানা যাবে না। তিনি ১৯৭৬ সালে তাঁর নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করে পরলোক গমন করেন।

[যুগের ডাক পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা ১৪১৯, চিঠিপত্র : বরদা চরণ ও নজরুল হতে]

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী
↓
পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
↓
মহাযোগী বরদা চরণ মজুমদার
↓
কাজী নজরুল ইসলাম

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নাম ভারতবাসী তথা বাংলাদেশের কারও কাছে অজানা নেই। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ দেশপ্রেমী, দেশমাতাকে ভালবাসার অপরাধে তাঁকে আজও দেশমাতার নিকট হতে দূরে বসবাস করতে হচ্ছে। সুভাষ বসুর যে পরিচয় অনেকের নিকট অজানা তা হল তিনি হলেন এক বিরাট যোগী পুরুষ।

মহাযোগী বরদাচরণ মজুমদারের শ্বশুরবাড়ি ছিল দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে। সেই সুবাদে তিনি দক্ষিণ কলকাতাতে যখন আসতেন তখন হরিশ মুখার্জী রোডের মল্লিক বাড়িতেও তিনি যেতেন। সেই সময় মহাযোগীর সান্নিধ্য পাবার জন্য অনেক গুণীব্যক্তির সমাবেশ হত বাড়িতে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ রায়ও ঐ বাড়িতে যাতায়াত করতেন। দিলীপ রায়ের সাথে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মল্লিক বাড়িতে গিয়ে মহাযোগী বরদাচরণ মজুমদারের দর্শন পান। সোমবার ১২ই জুন ১৯৩৯ সালে সকাল নটার সময় মহাযোগী বরদাচরণ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেন। এরপর সুভাষ বোস দেশমাতৃকার সেবার সাথে সাথে নিজ সাধন পথেও অগ্রসর হতে থাকেন। যোগীবর যখন কলকাতায় সেইসময় আসতেন সুভাষ বসু, নিয়মিত তাঁর সাথে যোগসাধনায় বসতেন। মহাযোগী বরদাচরণ মজুমদার বলতেন যে সুভাষ হল মহাক্ষত্রিয়, সাধন করে তার ব্রাহ্মণ দৃষ্টি যদি খুলে যায় তাহলে সে মহাবিপ্লব ঘটিয়ে দেবে।

এই ঘটনার কিছুদিন পর সবার অগোচরে সুভাষ বসু তাঁর নিজ জন্মভূমির পরাধীনতার গ্লানি মোছাবার জন্য দেশত্যাগী হন। তিনি যখন সাব-মেরিন করে দেশত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন সেই সময় ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরে সাবমেরিনের চারদিকে অসংখ্য বোমা বা কোন ধরনের অস্ত্র ফেলতে থাকেন। সেইসময় সুভাষ ছিলেন একেবারে ধ্যানমগ্ন। দেখা গেল বাহিরের কোনশক্তিই তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারল না। তিনি নিরাপদে গন্তব্য স্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হন। নেতাজী সুভাষ বোসের একান্ত কাম্য ছিল অখণ্ড ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।

ভারতমাতা ও গুরুদেবের অশেষ কৃপায় সুভাষ বসু আজও জীবিত আছেন, কারণ তিনি কোথায়? এবং কবে, কিভাবে মারা গিয়েছিলেন সে বিষয়ে কেউই কোন প্রমাণ দিতে পারেনি। কেন্দ্রীয় সরকারও স্বীকার করেছেন যে তিনি প্লেন এক্সিডেন্টে মারা যাননি। (তিনি যে বেঁচে আছেন তার কিছু প্রমাণ আছে) ভগবানের কাছে প্রার্থনা তাঁর জীবনকে আরও দীর্ঘায়ু করুন।

বর্তমান সারা পৃথিবীতে যে অস্থিরতা নেমে এসেছে সেই অস্থিরতাকে শান্ত করতে পারে একমাত্র ব্রাহ্মণ শক্তি। যোগীবর বরদাচরণ মজুমদার তাঁর প্রিয় শিষ্যের ব্রাহ্মণ দৃষ্টি খুলে দিন। সুভাষ আবার ভারতবাসীর মধ্যে প্রাণের শান্তি ফিরিয়ে আনুন। সমগ্র ভারতবাসী তখন আবার একযোগে বলবে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী
↓
পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
↓
মহাযোগী বরদাচরণ মজুমদার
↓
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

মহাত্মা গান্ধী

আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তথা সারা পৃথিবীর লোক এই নামটির সঙ্গে পরিচিত। তিনি ছিলেন জাতির জনক। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর প্রচেষ্টা অনুপ্রেরণা সর্বজনবিদিত। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন সেই সংগ্রামের পাশাপাশি তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা নিজেকে জানতে আগ্রহী ছিলেন।

পরমহংস যোগানন্দ যখন তাঁর ভারতীয় ধর্মের বিজয়ধ্বজা আমেরিকাতে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালে ফিরে এসেছিলেন গুরুদেব স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি ও পিতা ভগবতীচরণ ঘোষ আরও নিকট গুরুজন বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিলিত হতে, সেই সময় সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে আমন্ত্রিত হয়ে ক্রিয়াযোগের প্রচার করেছিলেন। তিনি যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁর ওয়ার্ধা আশ্রমে ছিলেন। তিনি পরমহংস যোগানন্দকে আমন্ত্রিত করেন তাঁর ওয়ার্ধা আশ্রমে।

মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পরমহংস যোগানন্দ মিস্ ব্লেচ ও মি. রাইটকে নিয়ে আগস্ট মাস ১৯৩৫ সনে ওয়ার্ধা আশ্রমে যান। সেই ভ্রমণের সময় পরমহংস যোগানন্দের নিকট ক্রিয়াযোগ দীক্ষা পাবার প্রার্থনা মহাত্মা গান্ধী পরমহংস যোগানন্দকে করেন।

পরমহংস যোগানন্দ মহাত্মা গান্ধীর আগ্রহ ও শিশুর সারল্যে ঈশ্বরানুসন্ধানের মন দেখে তিনি মহাত্মাজীকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করার কথা স্বীকার করেন। মহাত্মাজী যখন ক্রিয়াযোগে দীক্ষা গ্রহণ করবেন সেই সময় কয়েকজন সত্যাগ্রহীও তাঁদের ক্রিয়াযোগে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা প্রকার করেছিলেন।

পরমহংস যোগানন্দ নির্দিষ্ট সময়ে, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত দেশাই ডাক্তার পিঙ্গেল এবং আরও কয়েকজন ইচ্ছুক ভক্তকে একত্রে ক্রিয়াদানের সকল অনুষ্ঠান ও দীক্ষাদান পর্ব সমাপ্ত করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর খুব রোগা শরীর হলেও তা যথেষ্ট সুসংবদ্ধ, ক্রিয়াযোগের এক একটি অংশ তিনি সুন্দরভাবে বুঝে অনুশীলন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সব শেষে পরমহংস যোগানন্দ সকলকে মুক্তির পথের সন্ধানরূপ সাধন ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলতেন যে আমি সমস্ত ধর্মমতকেই বিশ্বাস করি, কারণ সকলের উৎস এক। আর আমি সর্বান্তকরণে গুরুবাদে বিশ্বাসী। গুরুই নিজেকে জানার পথ

দেখান। তিনি নিত্য গীতার শ্লোক ও রামায়ণ পড়তেন। তিনি সকলকে বলতেন গীতার পথই একমাত্র শান্তি প্রদান করতে পারে।

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী
↓
স্বামী যুক্তেশ্বর গিরি
↓
পরমহংস যোগানন্দ
↓
মহাত্মা গান্ধী

[যোগীকথামৃত পরমহংস যোগানন্দ]

আবদুল গফর খাঁন

এঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতে পারা যায় না, তবে যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী, তাঁর শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য যা বলেছিলেন তাতেই জানা যায় যে এই আবদুল গফর খাঁন একজন মুসলমান ধর্মাবলম্বী হয়েও তিনি একজন অতি উন্নত মানের ক্রিয়াবান ছিলেন। তিনি যোগিরাজের নিকট হতে ক্রিয়া দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী ছিলেন সেইকারণে যখন যোগিরাজের শিষ্যগণ সমবেত হতেন তখন তাঁকে দেখা যেত না।

একবার যোগিরাজ শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য কাশী গিয়েছেন গুরু দর্শন ও স্পর্শনের আশায়। কাশীতে থাকাকালীন একদিন সকালবেলায় গঙ্গাস্নান করে গুরুগৃহে আসছেন এমন সময় দেখলেন তাঁর আগে আগে আর একজন চলেছেন। সেই সময় পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়ও একজন উন্নত ক্রিয়াবান। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর অগ্রে যে ব্যক্তি যাচ্ছেন তিনি খুব উন্নত সাধক, তখন তাঁর মনে ইচ্ছা হল অগ্রের ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ করবার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভদ্রলোকটির সামনাসামনি হবার কারণে তিনি তাঁর চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার দেখলেন অগ্রের ভদ্রলোকও তাঁর চলার গতি সম পরিমাণ বাড়িয়েছেন। পঞ্চানন বাবা আরও চলার গতি বাড়ালেন, তিনিও বাড়ালেন। অবশেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এই ঘটনায় পঞ্চানন বাবার মনে হল তিনি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন। তাঁর গুরুদেব থাকতে তিনি অন্য মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এই ভাবতে ভাবতে গুরুগৃহে প্রবেশ করা মাত্র গুরুদেব বললেন যে, 'কি ধরতে পারলেন না', গুরুদেবের এই কথায় পঞ্চানন বাবা কাঁদতে কাঁদতে গুরুদেবের চরণে পড়লেন। তখন যোগিরাজ বললেন যে, উনি একজন মুসলমান, আমার শিষ্য। হিন্দুদের মধ্যে যদি কোন অসন্তোষ প্রকাশ পায় সেই কারণে তিনি কারও সাথে সাক্ষাৎ করেন না। তবে আপনি এখনও যদি তাঁকে দেখতে চান তাহলে বলুন আমি তাঁকে ডাকছি, আমি ডাকলেই তিনি আসবেন। তখন পঞ্চানন বাবা বললেন না, আমি আর তাঁকে দেখতে চাই না।

শোনা যায় আব্দুল গফর যোগিরাজের সামনে খুব কমই হাজির হতেন, তিনি যোগিরাজকে সর্বদাই বিরাট এক জ্যোতিপুঞ্জ হিসেবে দর্শন করতেন। গীতার ভাষায় সহস্র সহস্র সূর্যের তেজ যদি একত্র করা যায় তাহলে তোমার তেজের সমান হলেও হতেও পারে।

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী
↓
আবদুল গফর খাঁন

* লোকনাথ বাবাও এই মহাযোগীর সাথে ভ্রমণকালে মক্কায়, তাঁর নির্জন আস্তানায় দর্শন করেছিলেন। ❑

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥

[অ : ৬, শ্লোক : ২]

অনুবাদ ঃ হে অর্জুন! যাকে সন্ন্যাস বলা হয়, তাকে তুমি যোগ বলে জানবে, কেননা সংকল্প ত্যাগ না করলে কেউই যোগী হতে পারে না।

[অ : ৬, শ্লোক : ২]

ক্রিয়াযোগ কি দিতে পারে

যোগচার্য্য বাচস্পতি অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়

ক্রিয়া মানে কর্ম, কর্ম মানে ক্রিয়া। অতএব, যা ক্রিয়াযোগ তাই কর্মযোগ। কর্ম না করলে এই পৃথিবীতে আমরা কিছুই পাব না। অতএব জাগতিক কর্ম ছাড়া কোন উপায় নেই। জাগতিক কর্ম আমাদের কি দেয়? বেঁচে থাকতে গেলে ক্ষুধার নিবৃত্তি করা প্রয়োজন অতএব অন্ন চাই, ঔষধ চাই, পোশাক চাই, বাসস্থান চাই, শিক্ষা চাই, মান চাই, যশ চাই, প্রতিপত্তি চাই, ধনদৌলত চাই, এইভাবে পৃথিবী থেকে পৃথিবীর বস্তুকে নিংড়ে নিয়ে দেহ ও মনের পুষ্টিসাধন চাই। পৃথিবী থেকে এত কিছু নিয়েও মানুষ শান্তি পায় না। পৃথিবী অকৃপণভাবে সবকিছু দিয়েই চলেছে, মানুষ নিয়েই চলেছে অফুরন্তভাবে, তথাপি মানুষের জীবনে শান্তির বড় অভাব।

পৃথিবী থেকে মানুষ এতকিছু নিয়েও শান্তি পায় না কেন? এর কারণ এইসব ভোগ্যবস্তু মানুষ নিজে ভোগ করে না। মানুষ পৃথিবী থেকে এত কিছু আহরণ করে কেবল তার নিজের ভেতর অবস্থিত দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়দের সেবা করে, কিন্তু নিজের সেবা করে না। এই নিজেটা কে তা সাধারণ মানুষ জানে না, তাই দেহ, মন ইন্দ্রিয়গুলিকে 'নিজে' বলে মনে করে।

একজন হঠাৎ মরে গেল। একটু আগে সে কথা বলছিল, খাচ্ছিল, সব কিছু করছিল কিন্তু হঠাৎ কিসের অভাব হল যার জন্য ঐ মানুষটির মুখ আর কথা বলে না, চোখে দেখে না, কানে শোনে না, হাত-পা চলে না, ক্ষুধা লাগে না, পিপাসা লাগে না, শরীর বোধ নেই, তাই সে মৃত। কিসের অভাব হল? তার ভেতরে কি নেই? একের অভাবে সব থেমে গেছে। দেহরূপ রাজ্যের অধীশ্বর এই দেহের সমস্ত কর্ম থামিয়ে দিয়েছেন। মানুষ আমরা কি তাঁর সন্ধান কখনও করেছি। অতীতের ফেলে আসা জীবনে এমনকি এই বর্তমান জীবনেও কি তাঁর কথা একবারও ভেবেছি? তাঁর দিকে একবারও দৃষ্টি ফেরানোর প্রয়োজন বোধ করেছি? করিনি। কিন্তু কেন করিনি? করিনি এই কারণে যে আমি ছিলাম অজ্ঞানী। আমি জ্ঞানের সন্ধান করিনি, এতদিন কেবল দেহ, মন, ইন্দ্রিয় এদেরই আপনজন ভেবে এদের সেবায় মত্ত ছিলাম। ভেবেছিলাম এরাই আমাকে অনন্ত শান্তি দেবে। এইভাবে বহু জন্ম পার করতে করতে প্রভু তোমার দিকে দৃষ্টি গেল, ভাবলাম তুমি ছাড়া এ জগতে কিছু নেই, আমিও নেই। এই 'তুমিটা'ই যে 'আমি' এই বোধটাও আমার এতদিন হয়নি। যখন বোধটা এল তখন কোথায় পাব, কে পথ দেখাবে এই সন্ধান করতে করতে ইহ জীবনের বেশির ভাগটাই চলে গেল। তারপর পেলাম পথ প্রদর্শককে।

তখন তুমি আর আমি এক হয়ে আমাতেই ফিরে এলাম। তখন বুঝলাম ক্রিয়াযোগের অনন্ত মহিমা। যে আমাকে পৃথিবীর সবকিছু থেকে, সব আকর্ষণ থেকে এমন কি জন্ম-মৃত্যুর খপ্পর থেকে উদ্ধার করে আমাকে আমার উৎসস্থলে পৌঁছে দিল। ক্রিয়াযোগ এটাই দিতে পারে।

শুরু করলাম কঠোর তপস্যা, কঠোর তপস্যা করতে করতে যেদিন নিজের দিকে দৃষ্টি এল তখন দেখলাম কেবল তুমিই আছ, বুঝলাম সেই তুমি এবং আমি অভিন্ন। পেছন ফিরে দেখলাম যাদের আপনজন ভেবে এতদিন সেবা করেছিলাম তারা কেউ আর নেই। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য, শ্রবণশক্তি, মন, বিবেক, বুদ্ধি, অসভ্য ইন্দ্রিয়, রোগ, শোক, জরা-ব্যাধি, দেহবোধ, আপনপর জ্ঞান কেউ আর নেই। কেবল আমিই আছি। তখন তুমি আর আমি এক হয়ে আমাতেই ফিরে এলাম। তখন বুঝলাম ক্রিয়াযোগের অনন্ত মহিমা। যে আমাকে পৃথিবীর সবকিছু থেকে, সব আকর্ষণ থেকে এমন কি জন্ম-মৃত্যুর খপ্পর থেকে উদ্ধার করে আমাকে আমার উৎসস্থলে পৌঁছে দিল। ক্রিয়াযোগ এটাই দিতে পারে। ❑

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥

[অ : ৬, শ্লোক : ১১,১২]

অনুবাদ ঃ পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করবে; আসন যেন অতি উঁচু বা নীচু না হয়। কুশের উপর ব্যাঘ্রাদির চর্ম ও তার উপর বস্ত্র পেতে নিজের স্থির আসন স্থাপন করবে। সেই আসনে উপবেশন করে চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযমপূর্বক মনকে একাগ্র করে আত্মশুদ্ধির জন্য যোগভ্যাস করবে।

[অ : ৬, শ্লোক : ১১,১২]

রহস্যঘন মোহময় লাদাক ও স্বর্গীয় অমরনাথ

বিজন বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র ৬৭ বছরের যুবা আমি, ৬১ বছরের যুবতী বৌকে নিয়ে লাদাক আর অমরনাথ যেতে একটু চিন্তাই ছিল। এই যাত্রায় পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু মাউন্টেন পাস খুরদুমলা (১৮,৩৮০ ফুট) পার হতে হয়। সেখানে অক্সিজেনের অভাবে কারো কারো বুকে ব্যথা হয় শুনেছি। শেষে কত্তা-গিন্নী ঠিক করলাম, কম দিন তো বাঁচি নি, দুগ্গা বলে ঝুলে পড়ি। ঠিক করলাম কোনো গ্রুপের সঙ্গে যাবো না। তাতে ঝুঁকিটা আরও একটু বাড়ল ঠিকই, কিন্তু গ্রুপের সঙ্গে যাবার হ্যাপা আছে, ইচ্ছেমত চলা যায় না। জীবনে সব সময়ে অনেক কিছু মানিয়ে চলতে হয়। তাই এই কটা দিন আমরা দুজনে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে চাইলাম। এখন লিখতে বসে মনে হচ্ছে, ভাগ্যিস, সেটা করেছিলাম! বহু হিল স্টেশনে আগে ঘুরেছি- সিকিম, ভুটান, উত্তরখণ্ড (কেদারনাথ বদ্রীনাথও বাদ নেই), নৈনিতাল, সিমলা, শিলং, দার্জিলিং ইত্যাদি, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন জীবনের খাতায় বড় হরফে লিখে রাখার মত অভিজ্ঞতা। আমার কলম ভাল চলে না, তাই লেখার চেষ্টা না করে ছবি দিয়ে বর্ণনার অভাব পূরণ করছি।

লাদাক, যেটি ছোট তিব্বত বলেও পরিচিত, ভারতের একটি প্রান্তিক অঞ্চল। এর অবস্থান হিমালয়ের উত্তরে কারাকরামের দক্ষিণে তিব্বতী মালভূমিতে। লাদাক কথাটার অর্থ 'পাস-এর দেশ'। 'লা' হল মাউন্টেন পাস।

লাদাক, যেটি ছোট তিব্বত বলেও পরিচিত, ভারতের একটি প্রান্তিক অঞ্চল। এর অবস্থান হিমালয়ের উত্তরে কারাকরামের দক্ষিণে তিব্বতী মালভূমিতে। লাদাক কথাটার অর্থ 'পাস-এর দেশ'। 'লা' হল মাউন্টেন পাস (যেমন, নাথ লা, খারদুম লা, চ্যাং লা, ফটো লা ইত্যাদি)। বহু পাস যেমন আছে, তেমন আছে বরফ ঢাকা পাহাড় ঘেঁষে বহু মনেস্টারি (বৌদ্ধবিহার) এবং লেক (হ্রদ)। এখানে চোখে পড়বে তিন ধরনের স্থানীয় লোক - মন, দর্দ এবং মোঙ্গল। মনরা এসেছিল প্রথমে কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চল থেকে। এরপরে আসে দর্দ এবং মোঙ্গল।

লেহ-এর প্রাসাদ

জুন মাসের শেষাশেষি কলকাতা থেকে প্রথমে গেলাম দিল্লী - সেখান থেকে লেহ-তে। আমাদের ভাগ্য, আকাশে মেঘ ছিল না। নীচে বরফ ঢালা পাহাড়গুলো তাই চমৎকার দেখা যাচ্ছিল - হিল স্টেশন থেকে দেখা সাইড ভিউ নয়, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যাকে বলা হয় 'টপ ভিউ'। লেহ-তে একদিনের জন্যে বিশ্রাম - কম অক্সিজেনের আবহাওয়ায় শরীরকে সইয়ে নেবার জন্যে। পরের দুদিন লেহ-র প্রাসাদ, থিকসে মনেস্টারি, স্টক প্যালেস, শান্তি স্তুপা, স্পিতুক মনাস্টেরি, হেমিস মনাস্টেরি এবং হল অব ফেম দেখে নেওয়া গেল। এই থিকসে মনাস্টেরিতেই ছিল তিনতলা উঁচু বিখ্যাত মৈত্রেয় বুদ্ধ।

আমাদের আসল রোমাঞ্চকর যাত্রা শুরু হল তার পরের দিন থেকে। গাড়ি চেপে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম ১৫০ কিলোমিটার দূরে নুব্রা ভ্যালির দিকে। নুব্রা উপত্যকা ১০,০০০ ফুট উঁচুতে, খুব ঠাণ্ডা নয়- জলের প্রাচুর্য থাকায় জায়গাটা উর্বর। ১৮,৩৮০ ফুট উঁচুতে খরদুমলা মাউন্টেন পাস দিয়ে বরফের মধ্যে যাওয়াটা একটা অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। সৈন্যবাহিনীর লোকেরা আমাদের সতর্ক করল বেশিক্ষণ পাহাড়ের এই উচ্চতায় না থাকতে। একটা মেডিক্যাল সেন্টার ওখানে আছে উচ্চতাজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য। গাড়িতে একটা অক্সিজেন সিলিন্ডার আমাদেরও ছিল - তবে ব্যবহার করতে হয়নি।

নুব্রা উপত্যকায় প্রথম দিনই পানামিকে (প্রাচীন ইয়ারকাণ্ডি সিল্ক রুটের শেষ গ্রাম) পৌঁছে আমরা উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে পথের ক্লান্তি দূর করলাম। পরের দিন লেহ-তে ফেরার পথে আমরা ডিস্কিট আর হুণ্ডারে থামলাম। এ দুটিও নুব্রা উপত্যকায়। ডিস্কিটে একটা বিখ্যাত মনেস্টারি আছে, যার দেয়ালে চমৎকার সব ছবি আঁকা। এছাড়া কয়েকটা প্রস্তরমূর্তিও সেখানে আছে। হুণ্ডারে দেখতে পেলাম একটা সাদা মরুভূমি - সেখানে দু'কুঁজের উটের পিঠে চড়া যায়! একদিকে মরুভূমি, অন্যদিকে বরফাচ্ছাদিত পাহাড় - সত্যিই দেখার মত দৃশ্য!

পরের দিন লেহ-তে কাটিয়ে আমরা ১৪,২৭০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত বিহ্বলকারী সুন্দর প্যানগং লেক দেখতে গেলাম। ১৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ৫ কিলোমিটার প্রস্থের এই দর্শনীয় লেকটির ২/৩ ভাগই তিব্বতে, বাকিটা ভারতে। লেকে যাওয়ার ৫ ঘণ্টার পথের দু'দিকের দৃশ্যও দেখার মত। উচ্চতার জন্যে পাহাড়গুলোতে কোন গাছপালা নেই, কিন্তু পাথরের রঙে অনেক বৈচিত্র্য আছে। যাত্রার পথে পড়ল ছাংলা পাস (১৭,৫৮৬ ফুট) - পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম মাউন্টেন পাস। এবার উচ্চতার সঙ্গে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে গেছি। ছাংলা পাসে দু'জনে একটু হাঁটাচলা করলাম। সৈন্যবাহিনীর লোকেরা পর্যটকদের চা বিতরণ করছিল - তাও খেলাম।

তিনতলা উঁচু বিখ্যাত মৈত্রেয় বুদ্ধ

দূর থেকে প্যানগং হ্রদকে প্রথম দেখে মনে হয় একটা ক্যানভাসে আঁকা ছবি। হ্রদের সব থেকে কাছে একটা হোটেলে উঠে মালপত্র রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। হ্রদের পাশে বসলে দেখা যায় সূর্যের আলোয় জলে নীল সবুজ ফিকে গাঢ় কত রকম রঙের খেলা - আমাদের নির্বাক করে দিল! আশেপাশে কোন লোক নেই

- কেবল আমরা দু'জনে। শব্দ বলতে শুধু নুড়ির ওপর বয়ে যাওয়া জলের ঝিরঝির ঝিরঝির গান। এরকম জায়গাতেই মানুষ ধ্যানে বসতে পারে। খালি একটা কথাই ঘুরে ফিরে আসছিল, 'প্যানগং- তুমি আমাকে দিলে আত্মার প্রশান্তি'। মানস সরোবর দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি, শুধু ছবিতেই দেখেছি। সেই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মনে হল প্যানগং প্রায় সেরকমই। বসে বসে কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়ালও করি নি। লেক থেকে যখন হোটেলে ফিরছি তখন দেখি পাঁচ ঘণ্টা কখন পার হয়ে গেছে!

খরদুমলা পাস–কেউ বরফের স্নো-ম্যান বানিয়েছে

আবার এক রাত কাটালাম লেহ-তে। এবার আমাদের গন্তব্য-স্থল সোমোরিরি হ্রদ। হিমালয় পার্বত্যাঞ্চলের এটিই সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত হ্রদ। সাত ঘণ্টার পথ - প্রায় সবটাই সিন্ধু নদের ধার দিয়ে।

খরদুমলা মাউন্টেন পাস–সূক্ষ্মাগ্র জমাট বরফ

সোমোরিরি ১৫,০৭৫ ফুট উঁচুতে, দৈর্ঘ্যে ১৯ কিলোমিটার প্রস্থে ৩ কিলোমিটার। প্যানগং-এর থেকে ছোট আয়তনের হিসেবে, কিন্তু কে মাপতে যাচ্ছে? আমাদের চোখে একই সাইজ। এটিও অপূর্ব সুন্দর। এখানে পাখির সমাবেশে বেশি বৈচিত্র্য আর বরফে ঢাকা পাহাড়গুলো দেখলে মনে হয় হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। চন্দ্রালোকিত রাতেও হ্রদটি দেখলাম - সারাজীবন মনে রাখার মত দৃশ্য। হাতছানি দিয়ে আমাদের অন্য এক জগতে নিয়ে যাচ্ছিল।

হুণ্ডারের দু-কুঁজের উট

ফিরে এসে লেহ-তে এক রাত বিশ্রাম, তারপর বিদায় নেবার পালা। যাবো আলচি-তে। যাবার পথে দেখে নিলাম লিকির মনাস্টেরি আর বসগো দুর্গ। দুর্গ বলার থেকে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বলাই ঠিক। অল্প একটু অংশ পর্যটকদের জন্যে খোলা আছে। আলচিতে আমরা একটা রাত কাটালাম। আলচি মনাস্টেরি দেখলাম। এখানে যেসব ছবি আছে - সেগুলো আগের মনাস্টেরিগুলোর ছবি থেকে ভিন্ন।

দূর থেকে প্যানগং-হ্রদ

পরদিন যাত্রা করলাম কার্গিলের পথে। ফোটোলা পাস (১৩,৪০০ ফুট) পার হবার পরে মুলবেকে দেখলাম বিশাল পাথর কুঁদে বানানো মৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি। পথে লামাযুরু মনাস্টেরি দেখে নিলাম। তখনই চোখে পড়ল দূরে পাহাড়ের একাংশ থেকে যেন হলুদ আভা বেরোচ্ছে। আমাদের ড্রাইভার জানালো ওটা পুরোপুরি 'মুলতানী মাটিতে' তৈরি, ওকে স্থানীয়রা চাঁদের পাহাড় বলে। কার্গিলে পৌঁছে এক রাত বিশ্রাম করে রওনা দিলাম সোনামার্গের দিকে। পথে পড়ল দ্রাসের ওয়ার মেমোরিয়াল - কার্গিলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জয়ের স্মৃতিতে বানানো।

কাছ থেকে প্যানগং-হ্রদ

সেনাবাহিনীর লোকেরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ - ঘুরে ঘুরে আমাদের পাহাড়ের বিভিন্ন চূড়া চিনিয়ে দিলেন যেখানে পাকিস্তানী সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল।

পথে আরেকটা পাস জোজিলা (১১,৫৭৫ ফুট)। পাসের কাছে রাস্তার দু'ধারে নিরেট বরফের দেয়াল। সোনামার্গে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল। বিশাল উপত্যকা সবুজে মোড়া। এখানেই লাদাকের সঙ্গে কাশ্মীরের তফাত। লাদাকের পাহাড়ে গাছপালা দেখা যাবে না। কাশ্মীরের পাহাড় সবুজে ভরা।

সোমোরিরি-হ্রদ

সোনামার্গ থেকে বেরোলাম অমরনাথ দর্শনে। অমরনাথের গুহা ১২,৭৫৬ ফুট উঁচুতে। সূর্য ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়লাম হেলিকপ্টার ধরতে - যাতে সেই দিনই ফিরে আসতে পারি। বালতাল থেকে হেলিকপ্টার ছাড়ে। ভাগ্য সহায়, প্যাসেঞ্জার লিস্টে আমাদের নামই প্রথমে। পবন হংসে চেপে পঞ্চতারিণী পৌঁছানো গেল। ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার দূরেই অমরনাথ। এই বয়সে আর সাহসে কাজ নেই, বাকি পথটা হাঁটার চেষ্টা না করে পালকিতে চাপলাম। পালকি মানে চেয়ারের দু'দিকে দুটো বাঁশ লাগানো - চারজন লোক সেই বাঁশ কাঁধে নিয়ে হাঁটবে। এতে দুটো সুবিধা। প্রথম সুবিধাটা বুঝতে অসুবিধা নেই - অন্যের ঘাড় ভেঙ্গে নিজের পথ-কষ্ট বাঁচানো। দ্বিতীয় সুবিধাটা ঐতিহ্যগত। এককালে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে গেলে মৃত ব্যক্তিকে লোকে খাটিয়ায় তুলে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করত। সে যুগ চলে গেছে - সে সুখ এখন প্রায় অন্তর্হিত; এখন গাড়িতে চাপিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই পুরনো সুখের

জোজিলা পাস-এর পথে

কিছুটা অন্তত জীবিত অবস্থায় এই পালকি-ব্যবস্থায় ভোগ করা যায়। শুধু খাটিয়াতে শুয়ে নয়, চেয়ারে বসে।

যেতে যেতে একবার তো হৃদস্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম। তিন দল তীর্থযাত্রী - কেউ আমাদের মত পালকি চড়ে, কেউ বা হেঁটে কেউ ঘোড়াতে একে অন্যকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করছিল। ধাক্কাধাক্কিতে কয়েক বার দেখলাম পালকিবাহকদের কেউ পা পিছলে পাহাড় থেকে উলটে পড়তে পড়তে কোনও মতে রক্ষা পেল। তবে সেনাবাহিনীর লোক বিপদজনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করার জন্য নজরদারি করছিল - তাই রক্ষা। অনেক সময়েই লোকদের লাইনে দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করাচ্ছিল যাতে বরফ পিচ্ছিল পথে হুড়োহুড়ি না হয়। যেতে যেতেই আমরা অমর গঙ্গা দর্শন করলাম - বরফের চাঁইয়ের নীচ দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। প্রায় তিন ঘণ্টা লাগলো উপরে উঠতে।

অমরনাথের পথে

গুহাটা আরও ৫-৬ তলা উপরে। সিঁড়িগুলো পিচ্ছিল বরফের জন্যে। দুয়েকবার পড়তে পড়তে কোনও মতে গুহাতে গিয়ে পৌঁছলাম। এখানে কোন গুঁতোগুতি নেই - সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে। সেনাবাহিনীর লোকেরা সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে বরফের সেই শিব-লিঙ্গ দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে - যার জন্যে তীর্থ যাত্রীদের এত সময় ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করে এত দূরে আসা। কেউই বঞ্চিত হচ্ছে না। আমরা অবশ্য তীর্থের পুণ্য আর প্রকৃতির সৌন্দর্য-দুটোই পেতে গিয়েছিলাম।

অমরনাথ দর্শনার্থীদের লাইন

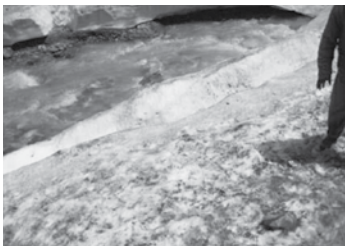
অমর গঙ্গা–বরফের চাঁইয়ের নীচ দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে

আবার পালকি চড়ে ফেরা। তবে এবার সময় লাগল অনেক কম। সোনামার্গ থেকে ফিরলাম শ্রীনগর হয়ে। ইচ্ছে ছিল গুলমার্গ, মুঘল গার্ডেনস ইত্যাদিতে যাবার। কিন্তু শ্রীনগরে কারফিউ। অগত্যা নাগিন হ্রদে হাউসবোট। সবকিছুরই ভালো দিক আছে। চমৎকার তিন বেডরুমের হাউসবোটে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী। দুদিন ধরে সিকারা চেপে ডাল আর নাগিন হ্রদের ছোট ছোট জলপথে ৭-৮ ঘণ্টা ঘুরে বেড়ালাম। হাউসবোটের সংলগ্ন জমিতে একদিকে বাগান। সেখানে নানান ফুলের গাছের সম্ভার। ফলের গাছও আছে - আপেল, ন্যাসপাতি আর বেদানা গাছ দেখলাম। আর আছে ছোট্ট সুন্দর ঘাস বিছানো একটা মাঠ।

সিকারা চেপে ফুল বিক্রেতা

অবশেষে ফিরলাম কলকাতায় নিজেদের আস্তানায়। আমাদের দুজনেরই জীবন-দর্শন-জীবনের ইনিংস শেষ করব কোনও আক্ষেপ না রেখে। তাই কি পাই নি তার হিসেব না করে - যা পেয়েছি তাই পুরোপুরি উপভোগ করে ফিরলাম। ❑

হাউসবোটে কাঠের কাজ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

[অ : ৪, শ্লোক : ১১]

অনুবাদ ঃ যে (ব্যক্তি) যেভাবে আমার উপাসনা করেন আমি (ফলদাতা পরমেশ্বর) তাকে সে ভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! মানুষ সর্বপ্রকারে আমার পথেরই অনুসরণ করে অর্থাৎ মানুষ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, সবপথেই আমাকে পাবে।

[অ : ৪, শ্লোক : ১১]

জগন্নাথদেবের রন্ধনশালায়

নিমাই দে

মহাপ্রসাদ। জগন্নাথদেবের জন্য তৈরি ভোগ। আর সেই কারণে নিত্যদিন পুরীর মন্দিরের রন্ধনশালায় চলে হাজার খানেক মানুষের রীতিমতো কর্মযজ্ঞ। তেলের প্রবেশ সে রান্নাঘরে নিষিদ্ধ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 'হোটেলে'র অভিজ্ঞতা নিয়েই লিখলেন নিমাই দে।

প্রভু জগন্নাথদেবের মূর্তি পুরীতে স্থাপন করার পর ধুমধাম করে পুজো হয়েছিল।

সেই সময় কিছু আচার এবং রীতিনীতি মেনে উৎসব-অনুষ্ঠানও। কিন্তু যা যা সেদিন হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহাপ্রসাদ বিতরণ। ভুবনেশ্বরের বি জে বি কলেজের ওড়িয়ার সিনিয়র রিডার ডঃ হরিহর কানুনগো তাঁর একটি লেখায় এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। লিখেছেন, তখন থেকেই শ্রীক্ষেত্র পুরীধাম ধর্মীয় মানচিত্রে একটি উল্লেযোগ্য জায়গা দখল করে নিয়েছে। জগন্নাথদেবকে উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করা মহাপ্রসাদ তখন থেকেই হয়ে উঠেছে পৃথিবী-বিখ্যাত।

দেশে বিখ্যাত দেবদেবীর মন্দির তো কম নেই। সব জায়গায় তাঁদের জন্য ভোগের বন্দোবস্তও আছে। কিন্তু এঁদের সঙ্গে পুরীর জগন্নাথদেবের মূল তফাত হল : সর্বত্র ভোগকে বলা হয় প্রসাদ। একমাত্র পুরীর জগন্নাথদেবের ক্ষেত্রেই তা হয়ে উঠেছে মহাপ্রসাদ। কারণ, এখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিয়ে কোনও ভেদাভেদ নেই। এই মহাপ্রসাদের এমনই মহিমা যে, একজনের ফেলে যাওয়া অবশিষ্টাংশ অন্যজন পরম আনন্দে গ্রহণ করেন। এজনের মুখ থেকে কেড়ে মহাপ্রসাদ অবলীলায় খেয়ে নিতে পারেন অন্য ভক্ত। হাজার হাজার ভক্তের মধ্যে যখন মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, তখন সব বিভেদ যেন ছিঁড়ে খান খান হয়ে যায়। সবার চোখেমুখে ফুটে ওঠে অনাবিল এক আনন্দ।

পুরীতে ঘুরলে পাণ্ডা বা পূজারিদের মুখে একটা ঘটনা যে-কেউই শুনতে পাবেন। সেটা হল ভগবান বিষ্ণুকে নিয়ে। কথিত আছে, বিষ্ণু দেশের চারটি ধর্মীয় পীঠস্থানকে তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এক, রামেশ্বর, যেখানে তিনি স্নান সারেন, দুই, বদ্রিনাথ, যেখানে ধ্যানে বসেন এবং চার, দ্বারকায় বিশ্রাম নেন। এর মাঝে তাঁর আহারের জায়গা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন কিন্তু পুরীকেই। এ থেকেই বোঝা যায়, ভগবানের কাছে এই জগন্নাথধামের ভোগ বা মহাপ্রসাদ ঠিক কতটা প্রিয়।

বিষ্ণু দেশের চারটি ধর্মীয় পীঠস্থানকে তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এক, রামেশ্বর, যেখানে তিনি স্নান সারেন, দুই, বদ্রিনাথ, যেখানে ধ্যানে বসেন এবং চার, দ্বারকায় বিশ্রাম নেন। এর মাঝে তাঁর আহারের জায়গা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন কিন্তু পুরীকেই।

এ তো গেল নাম মাহাত্ম্য। মহাপ্রসাদ তৈরির মাহাত্ম্যও পৃথিবীর তাবড় খাদ্য বিশেষজ্ঞকে মুগ্ধ করেছে। এখানকার রন্ধনশালা যেন এক বিস্ময়, সাধারণ বিচার-বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলাও দুষ্কর। হাজার হাজার, কখনও লাখো ভক্তের প্রসাদ তৈরি হচ্ছে এমন এক পদ্ধতিতে, যা নিয়ে গবেষণাও কম হয়নি। ভাবা যায়, পুরোটাই হল বয়েলিং বা সিদ্ধ করা! আর মাধ্যম বলতে পিতল, স্টিল বা লোহার পাত্র নয়, পুরোপুরি মাটির ভাঁড়, কলসি এবং হাঁড়ি। গ্যাসের চিহ্ন খুঁজে পাবেন না। জ্বালানি বলতে এখনও সেই বনের কাঠ। ভাত, ডাল, সবজি, পায়েস সবই হচ্ছে এভাবেই। বাড়িতে বা হোটেল-রেস্তোরাঁয় তো যে কোনও সবজি রান্নার আগে ভালো করে তেল-মশলা দিয়ে কষে নেওয়ার একটা ব্যাপার থাকে। তার উপরই নাকি রান্নার স্বাদ নির্ভর করে। অথচ এখানে সেসবের বালাই নেই। স্রেফ জলে চাল ভিজিয়ে কাঠের চুল্লিতে বসিয়ে দাও। ব্যাস, অন্নভোগ রেডি। সবজি কেটে মাটির কলসির মধ্যে থরে থরে সাজিয়ে দাও। তারপর পরিমাণমতো জল দিয়ে বসিয়ে দাও কাঠের চুল্লিতে। ব্যাস, সবজি তৈরি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এই সাধারণ এবং বিস্ময়কর পদ্ধতি মেনেই পুরীতে জগন্নাথদেবের ভোগ তৈরি হয়ে আসছে। এখানকারই এক পূজারি আরও অবাক করার মতো কথা শোনালেন। বললেন, জানেন, ভোগ তৈরির পর যখন তা মন্দিরে উৎসর্গ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আপনি টেরই পাবেন না, এর মধ্যে কী অপার মহিমা লুকিয়ে রয়েছে। মহাপ্রসাদকে এখানে বলা হয় 'অন্ন ব্রহ্ম'। রান্না করার পর তা প্রথম নিবেদন করা হয় জগন্নাথকে। কিন্তু তখনও তা মহাপ্রসাদে রূপান্তরিত হয় না। এরপর সেখান থেকে তা নিবেদন করা হয় দেবী বিমলাকে। এরপরই তা হয়ে ওঠে মহাপ্রসাদ। এই প্রসাদই যখন মন্দির থেকে নিয়ে আসা হয় ভক্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য, তখন তার মধ্যে কোথা থেকে যে এক অদ্ভুত সুগন্ধ মিশে যায়, তা এক অসীম রহস্য। অবশ্য ভক্তদের কাছে এটা প্রভুর কৃপা বলেই বিবেচিত হয়। এই সুগন্ধ আর কিছুই নয়, প্রভুর আশীর্বাদ। আর তাই না এই মহাপ্রসাদকে নিয়ে এত কাড়াকাড়ি। পুরীতে বিবাহসহ পারিবারিক নানা অনুষ্ঠানেও অতিথিদের মহাপ্রসাদ দিয়ে আপ্যায়ন করাটা রীতিই হয়ে গিয়েছে। হিন্দু পরিবারে এমন অনেক অনুষ্ঠান আছে, যেখানে মহাপ্রসাদ না গ্রহণ করে অন্য খাবার খাওয়াই চলে না।

পুরীর মন্দিরে সারা দিনে সাধারণত ছ'টি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে ভোগ দেওয়ার জন্য। জগন্নাথদেবের ব্রেকফাস্টের নাম হল গোপালবল্লভ ভোগ। এরপর ভোরে ভাত, পিঠা, ডালসহ প্রায় ১৩ রকমের আইটেম দিয়ে যে ভোগ দেওয়া হয়, তার নাম ধূপ বা পঞ্চ উপাচার। এছাড়া মধ্যাহ্ন ধূপ, সন্ধ্যা ধূপ এবং সর্বশেষ ডিনারে নাকি পান্তা ভাত। তবে দ্বিপ্রাহরিক নৈবেদ্যই হল সবচেয়ে জনপ্রিয়। কারণ, এতে আইটেমও থাকে অনেক বেশি। আর সেসবের রান্না নিয়েই মানুষের মধ্যে কৌতূহল সবচেয়ে বেশি।

এবার একটু মূল আকর্ষণ রন্ধনশালায় ঘুরে আসা যাক। গত বছর ডিসেম্বরে এখানে ঢোকার সৌভাগ্য হয়েছিল। জগন্নাথদেবের মন্দিরের চারটি প্রধান গেট। দক্ষিণ দিকের গেট দিয়ে ঢুকলেই সামনে প্রশস্ত চাতাল। তারই ডান দিকের কোণ ঘেঁষে সামনেই চেয়ার টেবিল নিয়ে একজন বসে। সেখানেই টিকিট কাটার ব্যবস্থা। এখানেই রন্ধনশালার শুরু। শুরুতেই আমার সঙ্গী এক পূজারি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হোটেল কী জানেন? আমতা আমতা করছি দেখে তিনিই উত্তরটা দিলেন। বললেন, এই তো যেখানে ঢুকছেন, জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা? এক সঙ্গে এখানে এক লক্ষ পুণ্যার্থীর রান্না অবলীলায় হয়ে যায়। তারপরেও কি একে এই তকমা দেওয়ার মধ্যে ভুল কিছু আছে? বিস্ময়ের ঘোর কাটছিল না। আর ভোগ মানে এক দুটো নয়, শোনা গেল ছাপ্পান্ন ভোগ। ভিতরে ঢুকতেই ডানদিকে চোখে পড়ল, একটু উঁচু চাতালের মতো জায়গায় প্রচুর মানুষ শুধুই নারকেল কোরার কাজ করে চলেছেন। পাশেই নানা ধরনের সবজি ডাঁই করে রাখা। আর এক দল ব্যস্ত সেসব কাটতে। জগন্নাথদেবের অতি প্রিয় একটি জিনিস হল নারকেল। প্রতিদিন শুধু নারকেলই আসে এক মিনি ট্রাক ভরতি করে। বাঁদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে প্রচুর মাটির হাঁড়ি, কলসি প্রভৃতি। নানা ধরনের সাইজ। রোজ এই হাঁড়ি-কলসিই লাগে কয়েক হাজার টাকার। এখান থেকেই ডানদিকে ঘুরলে সেই রহস্যে ঘেরা রান্নাঘর। ঘর না বলে বিশাল হলঘর বলাই ভালো। তবে ভিতরে রাঁধুনি বা পূজারি ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। দেওয়ালজুড়ে কিছুটা অন্তর অন্তরই কেটে কেটে ঘুলঘুলির মতো তৈরি করা আছে। সেগুলিতে চোখ রেখেই ভিতরে রান্নাবান্নার কাজকর্ম দেখা যায়। তবে এগুলি যে দেখার জন্য করা হয়েছে, এমনটা কিন্তু নয়। এগুলি আসলে হয়েছে বাইরে থেকে উনুন ধরানোর কাঠ ভিতরে পাঠানোর জন্য। হঠাৎ চোখে পড়ল কয়েকটি ঘুলঘুলিতে আবার চোঙার মতো লাগানো। এগুলি আসলে ভিতরে জল পাঠানোর মাধ্যম। কিন্তু প্রশ্ন হল, রান্নার জন্য যে জল লাগে, তা আসে কোথা থেকে। সেই পূজারি তখন নিয়ে গেলেন কাছেই একটি জায়গায়। সেখানে একটি বড় কুয়ো। এর গভীরতা নাকি কম করে ১০০ ফুট। এরকম আরও একটি কুয়ো রয়েছে বাঁদিকেও। একটির নাম গঙ্গা, অন্যটি যমুনা। পূজারি বলছিলেন, এর জল এতই সুস্বাদু যে খেলেই হজম। সারাদিন ধরে দুটি কুয়ো থেকে জল তোলার কাজেই নিযুক্ত রয়েছেন অন্তত চল্লিশ জন।

এ তো বাইরের দৃশ্য। ভিতরে কীভাবে চলে রান্নার কাজকর্ম। পূজারির কাছ থেকে জানা গেল, প্রত্যেক রাঁধুনির মুখ কাপড়ে বাঁধা থাকে। তাঁরা যখন ভিতরে যাবেন, পথে কারও তাঁদের শরীর স্পর্শ করার অনুমতি নেই। রান্নাঘর থেকে ভোগ মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ঘেরা রাস্তা রয়েছে, সেখানে এমনি সময় ঘোরাফেরা করায় আপত্তি নেই। কিন্তু ভোগ যাওয়ার সময় গেট বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই রাস্তা তখন যেন ভি আই পি করিডর।

জানা গেল, রান্নাঘরের মধ্যে রয়েছে তিন ধরনের চুল্লি। একটি ভাত, একটি সবজি এবং অন্যটি পিঠের জন্য। একেকটি চার ফুট বাই আড়াই ফুটের। গভীরতা দু'ফুট। মোট চুল্লির সংখ্যা নয় নয় করে আড়াইশো তো হবেই। রাঁধুনির সংখ্যাও কম করে ছ'শো। তাঁদের হাতে হাতে জিনিসপত্র জুগিয়ে দেওয়ার জন্য রয়েছেন শ'চারেক লোক। এই চুল্লিতেই হাঁড়ির উপর হাঁড়ি বসিয়ে স্রেফ আগুনের তাপে সিদ্ধ করে ভাত, ডাল, সবজি ইত্যাদি রান্না হচ্ছে। এক একটি চুল্লিতে নটি হাঁড়ি বসিয়ে খুব সহজেই রান্না হয়ে যায়। বাইরেও চারপাশে দেখা গেল, হাঁড়িতে কোথাও চাল ভরা চলছে, কোথাও সবজি, কোথাও আবার ডাল। তারপর তাতে প্রয়োজনমতো জল মিশিয়ে উনুনে চাপিয়ে দেওয়া। কিন্তু মশলাপাতি, নুন, চিনি এমনকী তেল? জানা গেল, এখানে তেলের কোনও ব্যবহারই নেই। সবজি ভরতি কলসির মুখটায় ঠেসে ঠেসে নারকেল কুড়ো ভরে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, তাপে সিদ্ধ হওয়ার সময় এ থেকেই তেল বেরিয়ে খাবারে মিশে যায়। সত্যিই ঘোর কাটছিল না।

বর্তমানে ফাস্ট ফুডের যুগে তেল, আলু ও নুন তো খাবারের তালিকা থেকে অনেকে বাদই দিয়ে দিয়েছেন। এখানে জগন্নাথদেবের ভোগ রান্নার সময়ও এই তিনটি জিনিস একরকম ব্রাত্যই রাখা হয়। নুন না দিলে যেহেতু খাবারের স্বাদই আসে না, তাই ইদানিং নাকি নামমাত্র তা দেওয়া হয়ে থাকে। আর আলু কোনও কালেই জগন্নাথদেবের না পছন্দ। তাই আলুর এখানে নো এন্ট্রি। তবে চাল যা লাগে, তা চোখ কপালে তোলার মতো। এমনিতে সাধারণ দিনে এর পরিমাণ ৩০ থেকে ৭০ কুইন্টাল। আর উৎসবের মরশুম হলে তা পৌঁছে যায় অন্তত ১০০ কুইন্টালে।

সবকিছু দেখতে দেখতে এগিয়ে চলার মাঝে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াতেই হল। একটি ছোট্ট ঘরে ঢেঁকিতে চাল কোটা হচ্ছে। দু'জন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সেই কাজ করে চলেছেন। বর্তমান যুগে এখনও ঢেঁকি? উত্তরটা দিলেন পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা পূজারি। আসলে মেশিনে গুঁড়ো করা চালের পিঠে ঠাকুরের একেবারেই পছন্দ নয়। তাই যত পিঠে সারাদিনে তৈরি হয়, সবই এই ঢেঁকিতে গুঁড়ো করা চালে।

জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা যেমন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কিচেন, তেমনি ভোগ বিক্রির জায়গাটিও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ওপেন এয়ার হোটেল। হ্যাঁ, নামটা সবারই জানা, আনন্দবাজার। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত এই বাজারে নানা রকমের ভোগ বিক্রি হয় দেদার। যে কেউই কিনতে পারেন।

সব মিলিয়ে প্রভু জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা এবং মহাপ্রসাদ যেন পৃথিবীর বিভিন্ন আশ্চর্যেরই একটি। ❑

অমৃতের কলস নাসিকে

পারমিতা মুখোপাধ্যায়

[অমৃতকুম্ভ! সুরাসুরের সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত অমৃতকলস। যে কলস থেকে অমৃতের বিন্দু ক্ষরিত হয়েছিল এই ভারতের চারটি স্থানে। হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক এবং উজ্জয়িনী। কত কত বছর আগেরকার কথা। অথচ আজও অমৃতের আশায় মানুষ ছুটে চলে কুম্ভমেলায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ। ধনী, দরিদ্র, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে কোন বিশেষ দেবদেবীর পুজোর জন্য নয়, কেবল কুম্ভস্নানের জন্য - অমৃতলাভ করে পাপমুক্ত হয়ে এক পবিত্র জীবন লাভের আশায়। বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস। ভারতবর্ষের মানুষই বোধ হয় একমাত্র এই অপরিসীম বিশ্বাসের অধিকারী - আধ্যাত্মিক পুণ্যলাভের জন্য তারা যে কোন কিছু করতে প্রস্তুত। এই সেই বিশ্বাস যা পাহাড় টলিয়ে দিতে পারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই বিশ্বাস নিয়ে পথ চলে - কুম্ভস্নানে মুক্তি হোক এই শরীরের - শোক, তাপ, দুঃখ এইসব কিছু থেকে মুক্ত হোক জীবন - চলুক অমৃতের পথে।]

পুরা প্রবৃত্তে দেবানাম
দেবৈসহ মহারণে।
সমুদ্রমন্থনাপ্রাপ্তং
সুধাকুম্ভ নদা সুরৈ॥
তস্মাৎকুম্ভাত্সমুৎপত্রঃ সুধাবিন্দু মহীতলে।
যত্রযত্রাপনত তত্রকুম্ভপর্ব প্রকির্তিত।।

ফিরে যাই অনেক অনেক বছর পেছনে। একটি কাহিনীর অবতারণা করি। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর হস্তী ঐরাবতে চেপে বের হয়েছেন। ঐরাবতের ওপর আসীন ইন্দ্র উজ্জ্বল, প্রভাময়। দুর্বাসা মুনি ইন্দ্রের ওই রূপ দেখে বিমোহিত হলেন। দুর্বাসা তাঁর গলার মালা খুলে উপহার দিলেন দেবরাজকে। কিন্তু কি দুর্বিপাক দুর্বাসার নিক্ষেপিত মালা ইন্দ্র ধরে নিতে অসমর্থ হলে; সে মালা ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল এবং মুহূর্তের মধ্যে দলিত হল ঐরাবতের পায়ের তলায়। কি! এত বড় স্পর্ধা! দুর্বাসা মুনি ক্রোধে জ্বলে ওঠেন। আমার দেওয়া মালার এমন অবমাননা! না, কিছুতেই এ হতে পারে না। আমি অভিশাপ দিচ্ছি...। শিহরিত হন ইন্দ্র। না, মহর্ষি, না। অভিশাপ নয় অভিশাপ নয়....! কিন্তু কে কার কথা শোনে। দুর্বাসা মুনি ক্রোধান্বিত। অতএব, অভিশপ্ত ইন্দ্রকে হতেই হবে। কি অভিশাপ? না, খর্ব হোক ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের ক্ষমতা। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের শক্তি তো কমে গেল। এতে লাভ হল অসুরদের। ত্রিপুরাসুর হয়ে বসল দেবলোকের অধিপতি। অগত্যা দেবতারা আর কি করেন! তাঁরা শরণাপন্ন হলেন ভগবান বিষ্ণুর। বিষ্ণু দেবতাদের উপদেশ দিলেন যেন তাঁরা দানবদের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং তাদের সমুদ্রমন্থনে সাহায্য করতে বলেন।

দেবতাদের একার পক্ষে সম্ভব নয় সমুদ্রমন্থন–দানবদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন, তাই বিষ্ণু এই কৌশলটি দেবতাদের আয়ত্ত করতে বললেন। সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত হবে 'অমৃত'। সেই অমৃতপানে দেবতারা হয়ে উঠবেন অমর। বিষ্ণুর পরামর্শমত দানব অধিপতি ত্রিপুরাসুরকে আহ্বান করলেন সমুদ্রমন্থনের জন্য। ত্রিপুরাসুর রাজি হল একটা শর্তে; তা হল সমুদ্রমন্থনের ফলে উদ্ভূত অমৃতের ভাগ দানবদেরও দিতে হবে। সমুদ্রমন্থনের তোড়জোড় শুরু হল। দেব আর দানব মন্দার পর্বতকে উঠিয়ে নিয়ে এল। বাসুকি নাগ বেষ্টন করলেন সেই মন্দার পর্বতকে। বিষ্ণু হলেন কূর্ম অবতার। কূর্মের রূপ ধরে তিনি সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন। পৃষ্ঠে ধারণ করলেন মন্দার পর্বতকে। এইবার সেই পর্বতের আবেষ্টনকারী বাসুকী নাগের দু'প্রান্ত ধরে দেব আর দানব মন্থন করতে লাগলেন সমুদ্র। সমুদ্রমন্থনের ফলে উঠে এল বহু মূল্যবান সামগ্রী এবং তার সঙ্গে ধন্বন্তরী নিয়ে উঠলেন অমৃতের ভাণ্ড। অমৃতের কলস তো উঠল কিন্তু দানবদের কি সে অমৃতের ভাগ দেওয়া যায়? না, কখনো নয়। দেবগুরু বৃহস্পতির তত্ত্বাবধানে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে সেই অমৃতভাণ্ড রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হল ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে। চন্দ্রকে দেওয়া হল প্রহরার ভার। দেবতারা সেই অমৃতভাণ্ড অসুরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পালিয়ে বেড়ালেন তিন লোক - পাতাল লোক, মৃত্যুলোক এবং স্বর্গলোক। তাঁরা বারো দিন ছিলেন মৃত্যুলোকে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে। এই বারো দিন পৃথিবীর হিসেবে বারো বছর। এই সময় এই অমৃতভাণ্ড রাখা হয়েছিল চারটি স্থানে - হরিদ্বার, প্রয়াগ, ত্রিম্বকেশ্বর-নাসিক এবং উজ্জয়িনী। এই চারটি স্থানে কলস থেকে অমৃতরস ক্ষরিত হয়েছিল; তাই এই চারটি স্থান অমৃতসুধারস বিজড়িত। প্রতি তিন বছর অন্তর এই চারটি স্থানে অনুষ্ঠিত হয় কুম্ভমেলা। এক একটি স্থানে প্রতি বারো বছর অন্তর ফিরে আসে কুম্ভযোগ। নাসিকের কাছে ত্রিম্বকেশ্বরে গোদাবরী তীরে কুম্ভস্নানকে বলা হয় 'সিংহস্থ কুম্ভ'। যখন সূর্য এবং বৃহস্পতি সিংহরাশিতে উপস্থিত হয় তখন তাকে সিংহস্থ কুম্ভযোগ বলা হয়ে থাকে। সাধারণত এই যোগ ভাদ্রপদ অর্থাৎ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে হয়। এই বছর নাসিক-ত্রিম্বকেশ্বরে এই যোগ রয়েছে, তাই ১লা আগস্ট থেকে ২৭ শে সেপ্টেম্বর (২০১৫) অবধি বিশেষ বিশেষ দিনে চলবে কুম্ভস্নান। বারো বছর অন্তর পূর্ণ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয় হরিদ্বার, এলাহাবাদের প্রয়াগ, নাসিক-ত্রিম্বকেশ্বর ও উজ্জয়িনীতে। প্রতি ছয় বছর অন্তর হরিদ্বার ও এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয় অর্ধকুম্ভ। একশো চুয়াল্লিশ বছর অন্তর প্রয়াগে আয়োজিত হয় মহা-কুম্ভমেলা। স্নানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই মেলা আয়োজিত হয় নদীর তীরে। হরিদ্বারে গঙ্গা, প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে, নাসিক-ত্রিম্বকেশ্বরে গোদাবরী তীরে এবং উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীতীরে। এই বছর নাসিক-ত্রিম্বকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কুম্ভমেলা। এর পূর্বে নাসিকে ২০০৩-০৪ সালে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রয়াগ, হরিদ্বার এবং উজ্জয়িনীতে বৈষ্ণব আখড়া এবং শৈব আখড়ার সন্ন্যাসীরা একই সঙ্গে স্নান করেন। কেবল নাসিক-ত্রিম্বকেশ্বরে তাঁরা আলাদা স্নান করেন। বৈষ্ণব আখড়ার সাধুরা নাসিকে এবং শৈব বা উদাসীন আখড়ার সন্ন্যাসীরা স্নান করেন ত্রিম্বকেশ্বরে। নাসিকের আরও একটি তাৎপর্য আছে যে এখানে দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্র তাঁর বনবাসের কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। ত্রিম্বকেশ্বরে রয়েছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের এক লিঙ্গ।

একশো চুয়াল্লিশ বছর অন্তর প্রয়াগে আয়োজিত হয় মহা কুম্ভমেলা। স্নানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই মেলা আয়োজিত হয় নদীর তীরে। হরিদ্বারে গঙ্গা, প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গমে, নাসিক- ত্রিম্বকেশ্বরে গোদাবরী তীরে এবং উজ্জয়িনীতে শিপ্রা নদীতীরে।

কলসস্য মুখেবিষ্ণু
কণ্ঠে রুদ্র সমাশ্রিতঃ।
মুলেত্বস্য স্থিতো ব্রহ্মা
মধ্যে মাতৃগণাঃ স্মৃতাঃ॥
কুক্ষৌ তু সাগরাঃ সর্ব
সপ্ত দীপা বসুন্ধরা।
ঋগ্বেদো যজুর্বেদো সামবেদোহখণঃ।।

কুম্ভমেলা। কুম্ভ অর্থ কলস এবং মেলা অর্থ অনেক মানুষের সমাহার। এই কুম্ভের অন্তর্নিহিত অর্থ কিন্তু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কুম্ভ বা কলসের মুখের খোলা অংশটি বিষ্ণুর প্রতীক। কলসের গলার অংশ রুদ্রের প্রতীক। যে ভিত্তির ওপর এটি নির্মিত তা ব্রহ্মার প্রতীক। সমস্ত দেবীগণ অধিষ্ঠিত কলসের কেন্দ্রে। সকল মহাসাগর এবং চার বেদও অধিষ্ঠান করছে এর অভ্যন্তরে। মানুষের শরীরও কুম্ভ। গর্ভ, পৃথিবী যা প্রাণকে আত্মাকে ধারণ করে থাকে - ধারণ করে থাকে জল, অমৃত। কলস, সমুদ্র, নদী, পুষ্করিণী, কূপ এসবই কুম্ভের প্রতীক কারণ এরা সকলেই জলকে ধারণ করে থাকে। বায়ু আকাশকে বেষ্টন করে থাকে, সূর্য তার আলো দিয়ে ঘিরে রাখে এই মহাবিশ্বকে।

মানবশরীর আচ্ছাদিত কোষ দিয়ে। পঞ্চতত্ত্ব - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম - এখানেই মানবদেহের লয়। কিসের আশায় আসে লক্ষ লক্ষ মানুষ কুম্ভমেলায়? আসে আত্মানুসন্ধানের জন্য - নিজেকে খুঁজে ফেরে মানুষ! আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? কোথায় গেলে পাবো সেই পরম সত্যকে? তারা কুম্ভের পুণ্যস্নানে অর্জন করে চলেছে আত্মানুসন্ধানের নিগূঢ় তত্ত্বকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে।

কুম্ভমেলা - এ যেন এক ক্ষুদ্র ভারতবর্ষ। সমগ্র ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার মিলনস্থল এই কুম্ভমেলা। সন্ন্যাসী, বৈরাগী, উদাসীন, সাধু, সন্তদের মিলনক্ষেত্র। কুম্ভ পূর্ণ হয়ে ওঠে প্রেম, একতা, জ্ঞান, ভ্রাতৃত্ব এবং আধ্যাত্মিকতায়। এই সব মহতী গুণ অবিরল ক্ষরিত হচ্ছে কুম্ভ থেকে - এই তো অমৃত; জীবন-অমৃত। এই অমৃত কখনও শুকিয়ে যায় না বা শূন্যও হয় না। এই জীবন অমৃতই আমাদের শক্তি দেয় জীবনের পথে এগিয়ে চলার।

নাসিক-ত্রিম্বকেশ্বরে কুম্ভমেলার সময়কাল প্রায় এক বছর। এই বছর ১৪ই জুলাই কুম্ভমেলা শুরু হয়েছে নাসিকের রামকুণ্ডে পতাকা উত্তোলন সহকারে। সমগ্র অনুষ্ঠান বিধিবদ্ধভাবে শেষ হবে ১১ই আগস্ট ২০১৬ সালে।

মহারাষ্ট্র সরকার প্রদত্ত ২০১৫ সালের বিশেষ স্নানের তারিখগুলি দিয়ে দেওয়া হল। ১৪ই আগস্ট সাধুগ্রামের আখড়ায় পতাকা উত্তোলন, ২৬ শে আগস্ট শ্রাবণ শুদ্ধ প্রথম স্নান, ২৯শে আগস্ট প্রথম শাহী স্নান, ১৩ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় শাহীস্নান, ১৮ই সেপ্টেম্বর তৃতীয় শাহী স্নান, ২৫শে সেপ্টেম্বর ভাদ্রপদ শুক্লা দ্বাদশী - বামন দ্বাদশী স্নান। নবী মুম্বইয়ের ভাসিগাঁওয়ের ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে সংগ্রহ করা গেল কুম্ভস্নান সম্পর্কিত কিছু খবর। নাসিকে তপোবনে কপিলাসংগমের কাছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রম আছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতে স্নানের যোগগুলি হল ১৭ই আগস্ট প্রথম কুম্ভস্নান, ২৬শে আগস্ট বিশেষ কুম্ভস্নান, ২৯ শে আগস্ট রাখী পূর্ণিমা স্নান, ১৩ই সেপ্টেম্বর মৌনী অমাবস্যা স্নান, ১৮ই সেপ্টেম্বর ঋষি পঞ্চমী স্নান। নাসিকে প্রধান স্নানের ঘাটগুলি হল রাম ঘাট, কপিলা সঙ্গম, তপোবন, পঞ্চবটী।

'আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে'

কুম্ভমেলা নিয়ে অনেক কিছু লেখা হল, এবার মুম্বইয়ে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কিছু খবর দিয়ে দিই। তার আগে একটু গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন। মুম্বইয়ে আষাঢ় আসার আগেই বর্ষা এসেছিল ঠিকই কিন্তু তারপর ছিল এক দীর্ঘ বিরতি। চারিদিকে গেল গেল রব উঠে গিয়েছিল। এত কম বৃষ্টিতে জল কি করে পাওয়া যাবে! এই রুখাশুখা পশ্চিমের শহরটায় এই বর্ষার তিন চারটে মাসই যা বৃষ্টি। তারপর তো সারা বছর বৃষ্টিবিহীন দিনগুলোর চূড়ান্ত একঘেয়েমি। তা সে যাই হোক, শ্রাবণ মাস পড়েছে আর মুম্বইয়েও বৃষ্টিরা নেমে আসছে জয়োল্লাসে। স্বস্তির নিঃশ্বাস, এবার বোধহয় জলকষ্টের কবলে পড়তে হল না। শ্রাবণ, শ্রাবণ, শ্রাবণ! 'শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায় ক্ষণে ক্ষণে'। মনের মাঝে বিদ্যুতের ঝলকানির মতই মাঝে মাঝেই ঝিলিক দিয়ে ওঠে গত ফাগুনে বেলাপুরের আর্বান হাটে অনুষ্ঠিত লালমাটি উৎসবের আবির রঙা খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগুলো। সেই উৎসবের কাণ্ডারি ছিলেন রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়। সেই উৎসবের স্মৃতি এখনও ফিকে হয় নি। আবার আর একটি অনুষ্ঠানের হাতছানি। শ্রাবণ-পূর্ণিমায়-শ্রাবণ সন্ধ্যা। মুম্বইয়ের খ্যাতনামা শিল্পীদের গান, নাচ ও আবৃত্তির অনুষ্ঠান। রঞ্জিত ঝর্না কাঁসাই ইকো ফাউণ্ডেশন, যার কর্ণধার রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায় এবং আরত্রিকা (ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্ট) এর নিবেদন এই শ্রাবণ সন্ধ্যা। সঙ্গীত পরিবেশনায় সূর্য ভট্টাচার্য, শর্মিলা সরকার, মৈত্রেয়ী বসু, কোয়েল ত্রিপাঠী, উন্মনা দত্ত, সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, সৌম্যকান্তি অধিকারী। নৃত্যে নিবেদিতা মুখোপাধ্যায় এবং আরত্রিকা। আবৃত্তিতে মলি দত্ত, তাপস মাইতি এবং তাপস কর। অনুষ্ঠানের মূল ভাবনায় রাজর্ষি এবং পথিকৃৎ। শ্রাবণ সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হবে ২৯শে আগস্ট, শনিবার রাখী পূর্ণিমায়; থানের ডক্টর কাশীনাথ ঘানেকর অডিটোরিয়ামে (মিনি) সন্ধে সাড়ে সাতটায়। দেখা যাক, 'লালমাটি'র রাজর্ষি শ্রাবণ পূর্ণিমাতে আমাদের কোন বৃষ্টিভেজা আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যান।

স্মৃতি সততই সুখের- এই আপ্তবাক্যটি সবসময় খাটে না। কোন কোন বেদনাভারাতুর স্মৃতিও মনে গেঁথে থাকে সারা জীবন। আর এই বেদনার মধ্যে দিয়েই তো মানুষ প্রকৃত আনন্দের সন্ধান করে ফেরে। অমৃতের স্বাদ পেতে হলে যে হলাহলকেও কণ্ঠে ধারণ করতে হয়! সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু, আনন্দ-বেদনা - এতো মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়াকলাপ। দুঃখের আগুনে নিজেকে না পোড়ালে খাঁটি সোনা হয়ে উঠব কি করে? শ্রাবণ মাস এলেই আকাশ ভরা এত চোখের জল দেখে তাঁর কথা খুব মনে পড়ে যায়। কার কথা? কেন, আমাদের রবি ঠাকুরের কথা! এই শ্রাবণেই যে তিনি যাত্রা করেছিলেন অমৃতলোকের পথে। বাইশে শ্রাবণ। এই দিনটা চিরকালের জন্য বাঙালির মর্মে গাঁথা হয়ে গেছে। আমরা বাঙালিরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাঝেও নিবিড়ভাবে রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেতে চাই। তাঁর রচনার বিচিত্র প্রকাশের মধ্যেই আমরা খুঁজে নিই আমাদের মুক্তি। আনন্দের অভিব্যক্তিতে যেমন খুঁজে পাই তাঁকে - তেমনই দুঃখের রাতে যখন সবাই চলে যায় মুখ ফিরিয়ে, বঞ্চনা করে এই সমগ্র জগৎসংসার; তখনও তিনিই আমাদের সহায়।

রবীন্দ্রগান বা কবিতার পরম ঐশ্বরিক উপলব্ধির মাঝেই মেলে মনের শান্তি। জীবন - এ তো এক রঙ্গমঞ্চ! অবিরত অভিনয় করে যাওয়া; আলোর বৃত্তটুকুর মাঝে। তার চারপাশে ঘন অন্ধকার। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ভালবাসার মানুষ - সকলের কাছ থেকেই একদিন বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয়। কোথায়? অন্ধকার পথ বেয়ে কোথায় সে যাত্রা আমাদের? আলোর দিকে, সেখানে পরম পুরুষের সাথে মিলনের আনন্দ; যে আনন্দ সর্বব্যাপী, আশা-আকাঙ্ক্ষারহিত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কার গানে বা কবিতায় পাব পরমপুরুষের সঙ্গে মিলনের গাঢ় অনুভব। তাই শেষ করার আগে রবি ঠাকুরের গানেই বলি-

শান্তিসমুদ্র তুমি গভীর,
অতি অগাধ আনন্দরাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা
করি নির্বাণ ভুলিব সংসার,
অসীম সুখসাগরে ডুবে যাব। ❑

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

[অ : ৪, শ্লোক : ৭, ৮]

অনুবাদ ঃ হে ভারত! যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, তখনই আমি সর্বেশ্বর হয়েও সাধুদের রক্ষার জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য নিজের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করে স্বীয় মায়াবলে দেহ ধারণ করে যুগে যুগে জনসমক্ষে অবতীর্ণ হই।

[অ : ৪, শ্লোক : ৭, ৮]

পুরুষোত্তম ধামের দিনপঞ্জি

সুব্রত দাসগুপ্ত

চারধামের অন্যতম ধাম পুরীর জগন্নাথধাম, কেউ বলেন শ্রীক্ষেত্র, কেউ বলেন নীলাচল আর কেউ বলেন পুরুষোত্তম ধাম। এই তীর্থক্ষেত্রের মন্দিরে নিত্যদিন স্থিত এই জগতের প্রভু জগন্নাথ।

বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের পূজা হয়ে থাকে। ভোর ৪.৩০ টা থেকে শুরু হয়ে রাত্র ১১ টা পর্যন্ত চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করবো। ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রভু জগন্নাথের কৃপা না হলে হয়তো এই প্রবন্ধ লিখতে পারতাম না, কারণ এটি আমার নিজস্ব উপলব্ধি। ২০১০ ও ২০১১ ইং দুইবার প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে পুরী রওনা হয়েও যেতে পারি নাই। আমার তৃতীয় চেষ্টার সময় জগন্নাথ সদয় হয়ে আমাকে কৃপা করে দর্শন দান করেন। সে অন্য প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে চাই না।

নিত্যদিনের প্রতিটি কাজের/পূজা অনুষ্ঠানের একটি নির্দিষ্ট নাম আছে।

ভোর ৪.৩০ টার সময় মন্দিরের দরজা খোলার (দোরপিঠা) পর মন্দিরের অভ্যন্তর জল দ্বারা পরিষ্কার করার নাম ভিতর-শুদ্ধি। এরপর ২১টি কর্পূর মিশ্রিত ঘি-এর প্রদীপদানের মাধ্যমে শুরু হয় মঙ্গল-আরতি। এরপর অভিষেক স্নানের জন্য বিগ্রহসমূহকে স্নানের বিশেষ পোশাক পরানো হয়।

অভিষেক: এই পর্বে বিগ্রহসমূহ একটি রৌপ্য নির্মিত আয়নার প্রতিফলনে স্নান করানো হয় পবিত্র কূপের জলে। স্নানের পূর্বে বিগ্রহসমূহকে তদ্রূপভাবে দন্ত মাজন ও জিহ্বা পরিষ্কার করানো হয়।

মলিমা: স্নানের পর বিগ্রহসমূহকে বিশুদ্ধ সিল্ক কাপড় পরানোসহ ফুল ও গয়নাদ্বারা সজ্জিত করা হয়।

রান্নাঘরে হোম: বিগ্রহসমূহে যে সময়ে পোশাক পরানো হয় ঐ সময়ে রান্নাঘরে রান্নার জন্য আগুন জ্বালানো হয়।

সূর্যপূজা: বেলা ৮.৩০ টার মধ্যে সূর্যদেবের পূজা সম্পন্ন করা হয়।

দ্বারপাল পূজা: একই সময় মন্দিরের দ্বারপালদের পূজা সম্পন্ন করা হয়।

গোপাল বাল্যভোগ: সকাল ৯ টার সময় একটি কাঁসার পাত্রে মুড়ি, নারিকেল, ঘি, দই, কলা, মিষ্টি ও পাপড়ী (পুরীতে দুধের ছানা দ্বারা তৈরি একপ্রকার পিঠা) জগন্নাথের সম্মুখে ভোগের জন্য নিবেদন করা হয়। উল্লেখ্য যে প্রত্যেকবার ভোগ নিবেদন-এরপর পানসুপারী নিবেদন করা হয়।

সকাল ভোগ: সকাল ১০ টার সময় নিবেদন করা হয় খিচুড়ি, ডালবড়া, হিংসহ পালংশাক, ছোলার পিঠা, ইডলী (এক প্রকার চালের পিঠা বা মালপোয়া) ও পায়েস। এরপর সকালের আরতি ও পুনঃ পোশাক পরিবর্তন।

মণ্ডপভোগ/উপল ভোগ: সকাল ১১ টা থেকে ৩ টার মধ্যে ভোগ মণ্ডপে অন্ন, বিভিন্ন রকমের ডাল, সবজি অন্ন ও মিষ্টি, ডালের পিঠা, গমের পিঠা, চালের পিঠা, গজা, মিষ্টি ও পায়েস নিবেদন করা হয়। ভোগ মণ্ডপে নিবেদিত ভোগ জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ হিসেবে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে মধ্যাহ্ন আরতি সম্পন্ন করে ৬টা পর্যন্ত বিশ্রাম। সন্ধ্যা ৬টার সময় শুরু হয় সন্ধ্যা আরতি।

সন্ধ্যা ভোগ: সন্ধ্যা ৭.০০ টার সময় ভোগের জন্য বিভিন্ন রকমের অন্ন, ডাল, পিঠা ও মিষ্টি নিবেদন এরপর পুনঃ পোশাক পরিবর্তন ও পুনঃ আরতি।

রাত্র ১১ টার সময় আবার বিভিন্ন মিষ্টি জাতীয় পিঠা নিবেদন করার পর বিগ্রহের নিদ্রার জন্য বিছানা তৈরি সহ কচি ডাব-এর জল ও ফুল প্রদান করা হয়। পরবর্তী দিন ভোর পর্যন্ত নিদ্রা।

> ৯ টি রান্নাঘরের মধ্যে ২ টির প্রত্যেকটির আয়তন প্রায় ২৫০০ বর্গফুট ও অন্য ৭ টি সামান্য ছোট। সবজিকাটা, মশলাবাটা, ধৌতকরণ এর কাজ রান্নাঘরের বাহিরের অঙ্গনে করা হয়। ভোগশালার অনেকগুলো কক্ষ স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

জগন্নাথের ভোগ তৈরি

পুরীতে তীর্থযাত্রীগণ শুধু প্রভু জগন্নাথের দর্শন নয় সেই সঙ্গে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ পাওয়াকে নিজেদের সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করেন এবং প্রিয়জনদের জন্য জগন্নাথের শুকনা প্রসাদ নিয়ে আসেন। প্রত্যেকদিন সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত জগন্নাথের ভোগের জন্য প্রায় ৫৬ রকমের বিভিন্ন ধরনের নিরামিষ ভোগ তৈরি হয়ে থাকে। এই ভোগ তৈরির কাজে প্রায় ৫,০০০ লোক নিয়োজিত আছেন। যাদের ১,০০০ জন পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন ভোগ তৈরি করে থাকেন। দেখা গিয়েছে প্রতিদিন ১৫-৪০ হাজার তীর্থযাত্রীর উপযোগী ভোগপ্রসাদ করা হয় এবং বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে এই সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

ভোগ তৈরি হয় অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায়। রান্নাঘরের আশেপাশে কুকুর, বিড়ালসহ যে কোন পশুর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ভোগশালার অবস্থান মন্দিরের সিংহদ্বারের বাম দিকে প্রায় এক একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত। ভোগশালার ভিত ভূমি থেকে কয়েক ফুট উপরে তৈরি করা হয়েছে। ৯ টি রান্নাঘরের মধ্যে ২ টির প্রত্যেকটির আয়তন প্রায় ২৫০০ বর্গফুট ও অন্য ৭ টি সামান্য ছোট। সবজিকাটা, মশলাবাটা, ধৌতকরণ এর কাজ রান্নাঘরের বাহিরের অঙ্গনে করা হয়। ভোগশালার অনেকগুলো কক্ষ স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রান্নাঘরে ৭৫২ টি চুলার প্রত্যেকটির আয়তন ৩ (তিন) বর্গ ফুট ও ঝিকাসহ উচ্চতা ৪ ফুট। চুলার ঝিকাগুলো চুলাতে এমন ভাবে বসানো হয় যে, যাতে করে বিভিন্ন আকৃতির পাত্র বসানো যায়। একটি চুলায় একই সঙ্গে ৯টি মাটির পাত্র বসানো যায় যাহার ৫টি ঝিকার উপর সরাসরি বৃত্তাকারে বসানোর পর দ্বিতীয় স্তরে ৫টি পাত্রের উপর ৩টি এবং তৃতীয় স্তরে ঐ ৩টি পাত্রের উপর ১টি পাত্র বসানো হয় পিরামিড আকারে। নীচে জ্বালানো কাঠের আগুন থেকে প্রত্যেকটি পাত্র উত্তাপ পেয়ে থাকে।

প্রত্যেকদিন রান্নার কাজে নতুন মাটির বিশেষ আকৃতির মাটির পাত্র ব্যবহার করা হয় যেগুলোতে কোন হাতল থাকে না।

প্রত্যেকদিন প্রায় ১০০০ লোক রান্নার কাজে নিয়োজিত থাকেন যারা বংশপরম্পরায় এই কাজ করে আসছেন। ১০০০ জন -এর মধ্যে ৫০০ জন হলেন মুখ্য পাচক বা শূর যারা সরাসরি রান্না করেন। ৩০০ জন যোগালি যাদের কাজ রান্না ঘরে চুলায় আগুন দেওয়া, মন্দিরের কূপ হতে রান্না ঘরে জল আনা, রান্নার পাত্রে বিভিন্ন উপকরণ রাখা ও পাত্র পরিষ্কার করা। অবশিষ্ট ২০০ লোকের (টুনিয়া) রান্না ঘরে প্রবেশাধিকার নাই কিন্তু বাইরের অঙ্গনে সবজি কাটা, বিভিন্ন ধরনের মশলা বাটা, নারিকেল কুরানোসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ করেন।

রান্নাকাজ সমাপ্ত হলে পাচকদের প্রধান শূরগণ একটি ভেজা রশি দ্বারা ফাঁস তৈরি করে রান্না করা পাত্রের গলায় ফাঁস লাগিয়ে একটি ঝুড়িতে ৪/৫ টি রান্না করা পাত্র সাজিয়ে রাখেন এবং ঐ রকম ২টি ঝুড়ি বাঁশের ভাড়ে করে কাঁধে তুলে গর্ভমন্দিরের নিকট সুড়ঙ্গপথে একটি নিভৃত কক্ষে বয়ে নিয়ে যান। রান্নাঘরের সঙ্গে উক্ত নিভৃত কক্ষটি একটি সুড়ঙ্গপথ দ্বারা যুক্ত বিধায় বাহিরের কেহ এই ভোগ পরিবহন প্রক্রিয়া দেখতে পান না। রান্না করার সময়ও রান্না করা ভোগ পরিবহনের সময় শূরগণ তাদের মুখ ও নাক কাপড় দ্বারা বেঁধে রাখেন যাতে করে রান্না করা ভোগের গন্ধ না নিতে পারেন এবং দৈবক্রমে হাঁচি কাশি দিয়ে ভোগ সামগ্রী নষ্ট না করতে পারেন। রান্না কাজ তদারকির জন্য একজন প্রধান থাকেন যাকে বলা হয় মহাশূর।

ঐ সময় পূজার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরোহিত ভোগ নিবেদন-এর বেদি জল দ্বারা পরিষ্কার করে উক্ত বেদিতে চাউল এর গুঁড়া দিয়ে বিশেষ ধরনের মণ্ডল অংকন করে প্রত্যেক বিগ্রহের জন্য রান্না করা সমুদয় ভোগ নিবেদন করেন এবং ভোগের নির্দিষ্ট মন্ত্র জপ করেন। জগন্নাথের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা ভোগের বৈশিষ্ট্য এই যে, রান্না করা সমুদয় ভোগ নিবেদন করা হয় যাহা সাধারণত অন্যান্য বিভিন্ন দেবমন্দিরে করা হয় না। ভোগ সমাপন হলে জগন্নাথের ভোগের কিছু অংশ পার্শ্ববর্তী মন্দিরে অবস্থানকারী বিমলা দেবীকে নিবেদন করা হয়। পুরীর অধিবাসীদের বিশ্বাস বিমলাদেবীকে ভোগ নিবেদন করার পর এই ভোগ হয় মহাপ্রসাদ। ❑

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

[অ : ৭, শ্লোক : ১৬]

অনুবাদ ঃ হে ভরতকুলগৌরব অর্জুন! আর্তিযুক্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থকামী ও তত্ত্বজ্ঞান অভিলাষী - এই চার প্রকার সুকৃতিশালী লোক আমার ভজনা করেন।

[অ : ৭, শ্লোক : ১৬]

বেদের যুগ থেকে ভাই হল ভগিনীর ধর্মরক্ষার প্রতীক

হারাধন চৌধুরী

বেদের যুগ থেকে ভাই-ই হলেন ভগিনীর ধর্ম রক্ষার প্রতীক। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পুরুষের কাছে তাঁর স্ত্রী বাদে যে কোনও নারী কন্যা, ভগিনী অথবা মাতার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। দিকে দিকে নারীর চরম লাঞ্ছনা অসম্মানের কালে বিষয়টি তাই নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন বলে মনে হয়। আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তাই বোন বা ভগিনীদের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

বোনদের কাছে ভাই অতি প্রিয়। তাই সব বিষয়ে তাঁরা ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করে থাকেন। যে কোনও বিপদ বা অমঙ্গল যাতে ভাইকে স্পর্শ করতে না পারে, বোনদের সেই প্রার্থনা থেকে প্রচলিত হয়েছে হিন্দুদের একাধিক পবিত্র আচার-অনুষ্ঠান। বাঙালিসমাজে তার একটি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা নামে পরিচিত। নেপালি হিন্দুদের কাছে এই আচারের নাম ভাইটিকা। নেপালি মেয়েরা ভাইদের কল্যাণ কামনায় তিওহার নামে আরও একটি আচার পালন করেন, সেটির সঙ্গে বাঙালিদের ভাইফোঁটার মিল অবশ্য বেশি। রাজস্থানের হিন্দু সমাজের ভাইদুজও আমাদের ভাইফোঁটার গোত্রের। বাংলায় জেলা বা অঞ্চল ভেদে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানের কিছু পার্থক্য অবশ্য আছে। তবে মিল-অমিল যাই থাক, তা গৌণ। ভাইয়ের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনার এই অনুষ্ঠানের মূল হল, একটি প্রাচীন বিশ্বাস - মৃত্যুসহ যাবতীয় মঙ্গল-অমঙ্গলের দেবতা হলেন যম। হিন্দু সমাজের বিশ্বাস, যম দেবতাকে তুষ্ট করতে কিংবা ঠেকাতে পারলেই অমঙ্গল, এমনকি অকাল মৃত্যুও রুখে দেওয়া সম্ভব। তাই বোনরা ভাইয়ের মঙ্গলকামনা করে বছরের একটি দিন - কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভাইয়ের কপালে মঙ্গলটিকা পরিয়ে দেন, যা ভাইদের জন্য রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে।

পুরাণের ব্যাখ্যা অনুসারে, পক্ষপাতশূন্য যম দেবতাই হলেন মৃতদের পাপ-পুণ্যের বিচারক। স্বর্গে বাস করলেও ইনি নরকের অধিপতি এবং ব্রহ্মার সভার বিশিষ্ট এক সভাসদও। ইনি সবচেয়ে পুণ্যবান বলে ধর্মরাজ বলেও আখ্যায়িত হয়েছেন।

যমকে নিয়ে এই বিশ্বাস ও কাহিনীর কিছুটা ঋগ্বেদ ও অথর্ব বেদের, কিছুটা আবার একাধিক পুরাণের। বেদ আর পুরাণের কাহিনী মিলেমিশেই জনপ্রিয় হয়েছে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান।

পুরাণের ব্যাখ্যা অনুসারে, পক্ষপাতশূন্য যম দেবতাই হলেন মৃতদের পাপ-পুণ্যের বিচারক। স্বর্গে বাস করলেও ইনি নরকের অধিপতি এবং ব্রহ্মার সভার বিশিষ্ট এক সভাসদও। ইনি সবচেয়ে পুণ্যবান বলে ধর্মরাজ বলেও আখ্যায়িত হয়েছেন। মৎস্য পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তাঁকে ধর্মরাজ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। স্কন্দ পুরাণ মতে, শিবকে তুষ্ট করেই তিনি ধর্মরাজ আখ্যা পান। বামন পুরাণ অনুসারে, যমরাজ এই অপার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে।

যমরাজ শান্তি বা নিবৃত্তি এনে দেন বলে তাঁর আর এক নাম শমন। পুণ্যবানদের কাছে নরনারায়ণরূপে এবং পাপীদের কাছে ভীষণমূর্তিরূপে ইনি দেখা দেন। যমলোকের চারটি দ্বার। তার মধ্যে শুধু দক্ষিণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে শুধু পাপীরা। তাই 'যমের দক্ষিণদ্বার' বলে একটি প্রবাদ চালু আছে। বোনদের লক্ষ্য থাকে, ভাইদের এই ভয়ংকর দক্ষিণদ্বারপ্রবেশ থেকে রক্ষা করা।

পুরাণ ভেদে যমের জন্মবৃত্তান্ত অবশ্য বিভিন্ন। কোথাও তিনি মহারাজ পৃথুর বংশীয় হরির্ধানের পুত্র। আবার কোথাও তিনি ব্রহ্মার নাতি ও সূর্যের পুত্র। তাঁর মাতা হলেন সাবিত্রী কিংবা রাজ্ঞী। পদ্মপুরাণে ইনি বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞা ও তাঁর স্বামী বিবস্বানের সন্তান। আবার কোথাও বলা হয়েছে, বিবস্বানের ঔরসে অদিতি অথবা সরণ্যুর গর্ভে যমের জন্ম। তবে সব জায়গাতেই যমীকেই যমের যমজ ভগিনী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যমীরই আর এক নাম যমুনা।

ঋগ্বেদের পঞ্চাশটি স্থানে যম দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীনতম এই বেদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ সূক্ত বা কবিতাটি হল যম-যমী সংবাদ। এখানে যমের প্রণয়প্রার্থী রূপে বর্ণিত হয়েছেন যমী। সহোদর ভাই যমের প্রণয়লাভের জন্য যমী পাগলির মতো হয়ে নানা ছলাকলাও করেন। কিন্তু যমকে কোনওভাবেই তিনি টলাতে পারেননি। যম বরং নানাভাবে ভগিনীকে বোঝান যে, সহোদর ভাই-বোনের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন মহাপাপ। তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, স্বয়ম্ভুদেবও এতে ভর্ৎসনা করবেন। সমাজের উঁচুতলার নরনারীরা এমন ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হলে সাধারণের মধ্যেও তার প্রভাব পড়বে। ধর্মের প্রতি আনুগত্য থাকলে এমন কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। যমের এমন সংযমী ও ধর্মাশ্রয়ী আচরণের কাছে যমীকে সেদিন হার মানতেই হয়েছিল। চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং অন্যায়ের প্রতি কঠোর মনোভাবই যমকে দেবত্বে উন্নীত করেছিল। ক্রমে তিনিই হয়ে ওঠেন সমাজশাসনের অগ্রদূত এবং সুসভ্যসমাজের ব্যাখ্যাতা।

মনে রাখতে হবে, ঋগ্বেদ যে সময়ের, তখন সমাজে ন্যায়-অন্যায়, বৈধতা-অবৈধতা, শ্লীলতা-অশ্লীলতা ইত্যাদির লক্ষণরেখা অঙ্কিত হয়নি। আদিম অভ্যাস ও আচার থেকে সমাজকে সভ্যতার নিগড়ে বাঁধার এটিই ছিল বোধহয় প্রথম সফল প্রয়াস।

এরপর ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে সম্পর্কের পবিত্রতাই যে সমাজে সর্বতোভাবে গৃহীত হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাই পুরাণের পরবর্তী পর্বে যমী বা যমুনার পুণ্যরূপই প্রচার পেয়েছে, যিনি কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে ভাই যমকে পুজো করেছিলেন এবং নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে পরিতৃপ্তি সহকারে খাইয়েছিলেন। আর এর ফলেই অমরত্ব লাভ করেন যম। যমের পূজায় যমী বা যমুনা মন্ত্র বলেছিলেন- "ভ্রাতৃস্তবানুজাতাহংভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্ ।/ প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥" বোন যমুনার প্রার্থনা ও আশীর্বাদে ভাই যমের অমর হওয়ার কাহিনীকে স্মরণ রেখেই প্রচলন হয়েছে ভাইফোঁটা ও সমগোত্রের অনুষ্ঠানগুলি। উল্লেখ্য, ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানটি এখন আনন্দানুষ্ঠানে রূপান্তরিত হলেও, আদিতে এটি ছিল এক ধরনের জাদু অনুষ্ঠান। ভাইকে ফোঁটা দেওয়া থেকে মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি সবই করা হত এই জাদুর লক্ষ্যে। বাঙালি বোনরা ভাইদের ফোঁটা দেওয়ার জন্য যে ছড়া বলেন, অঞ্চল বিশেষে তা বিভিন্ন রকম। যেমন চব্বিশ পরগনা, যশোর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের ছড়াটি এইরকম- "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, / যমদুয়ারে

পড়ল কাঁটা,/ ভাই আমার সোনার ভাঁটা,/ যমুনা দেন যমকে ফোঁটা,/ আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা,/ যম যেমন অমর–/ আমার ভাই যেন হয় তেমনি অমর।" আবার কোথাও শেষ দুটি লাইন এইরকম– "চন্দ্র সূর্য যতদিন/ আমার ভাইয়ের আয়ু ততদিন।" অন্যদিকে, কুমিল্লার প্রচলিত ছড়াটি হল–"স্বর্গে দুন্দুভি মর্ত্যে জুকার/ না যেও ভাই যম-দুয়ার, / ভগ্নি দুয়ারে দিয়া কাঁটা/ ভগ্নি দেয় ভাইরে ফোঁটা।"

অতএব এর থেকে পরিষ্কার হয় যে, যম বা ধর্মদেবতা হচ্ছেন ভাইদের প্রতিনিধি। বেদের যুগ থেকেই ভগিনীর ধর্মরক্ষার ভার ন্যস্ত হয়েছে ভাইদের উপর; এমনকী সেই ভগিনী সহোদরা না হলেও, অবুঝ কিংবা বেপরোয়া হলেও। ভাইরাই হলেন ভগিনীর ধর্মরক্ষার প্রতীক। সুতরাং ভগিনীর সঙ্গে অন্যায় করা ভাইদের পক্ষে মোটেই শোভা পায় না। এখানে ভগিনী শব্দটিকে বৃহৎ অর্থেই দেখতে হবে। নিজ স্ত্রী ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত নারীকেই একজন পুরুষ ভগিনীজ্ঞানে (ক্ষেত্রবিশেষে কন্যা ও মাতাজ্ঞানেও) দেখবেন।

সুতরাং দিকে দিকে বালিকা, তরুণী, যুবতী প্রভৃতিদের শ্লীলতাহানি ঘটনা একেবারেই এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মহাকাব্যদ্বয় রামায়ণ ও মহাভারতে এবং ভারতের বিভিন্ন পুরাণেও ভগিনীদের বিশেষ সম্মান দেখানো হয়েছে। রাজদরবারে প্রকাশ্যে চরম অসম্মান থেকে দ্রৌপদীকে রক্ষা করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। আর তিনি এটি করেছিলেন দ্রৌপদীকে ভগিনী-জ্ঞানেই। দ্রৌপদী একবার অভূতপূর্ব দরদি তৎপরতায় শ্রীকৃষ্ণের হাতের ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেছিলেন। যেখানে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের দুই মহিষী রুক্মিণী দেবী ও সত্যভামার চেয়েও উজ্জ্বল মনে হয়েছিল। তাতে ভগবান অত্যন্ত প্রীত হয়ে দ্রৌপদীকে আশীর্বাদ করেছিলেন- 'অক্ষয়ম্'।

দ্রৌপদীকে ভগিনী হিসেবে গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ সেদিন কথা দিয়েছিলেন, তাঁদের এই সম্পর্ক অক্ষয় হয়েই থাকবে; যে কোনও বিপদে তিনিই দ্রৌপদীকে রক্ষা করবেন। দ্রৌপদীর এই অসম্মানের পরিণাম কৌরবদের জন্য কী হয়েছিল, তাও আমরা জানি।

মহাভারতে আরও দেখতে পাই, ভীষ্ম বার বার সুযোগ পেয়েও শিখণ্ডীকে কখনও আঘাত করতে রাজি হননি, এমনকি আত্মরক্ষার জন্যও নয়! কারণ তিনি জানতেন, শিখণ্ডী দ্রুপদ রাজার পুত্র হিসেবে জন্মালেও শিখণ্ডী আসলে এক নারী। কাশীরাজের তিন কন্যার অন্যতমা অম্বা শিবের বরে শিখণ্ডীর রূপ নিয়ে এসেছেন। শকুনির যত নিন্দা থাক না কেন, তিনি পাণ্ডবদের সঙ্গে যাবতীয় শত্রুতা করেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রিয় ভগিনী গান্ধারীকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। অন্যদিকে, বিরাট রাজার কন্যা উত্তরাকে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বীর অর্জুনও ভারতবাসীর জন্য একটি মহৎ বার্তা রেখে গিয়েছেন। অর্জুন বলেছিলেন, আমি উত্তরার গুরু। গুরুর নিকট শিষ্যা পিতৃতুল্য। আমি যাকে কন্যাজ্ঞানে সংগীতশিক্ষা দিয়েছি, তার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হতেই পারে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার কথাও স্মরণ করতে পারি। আইরিশ তরুণী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল মানুষের সেবায় আত্মনিবেদন করার অঙ্গীকার করেছিলেন। এরপর স্বামী বিবেকানন্দের কাছে ব্রহ্মচর্যব্রতের দীক্ষা গ্রহণ করার পর তিনি আখ্যায়িত হয়েছিলেন সিস্টার বা ভগিনী নিবেদিতা নামে। অচিরেই তিনি সারা ভারত, এমনকী বিশ্ববাসীর প্রিয় ভগিনী হয়ে উঠেছিলেন। মার্গারেট সম্পর্কে ভারতবাসীর মনে এমন পবিত্রতা জাগবে না-ই বা কেন, তিনি যে ছিলেন শ্রীমা সারদা ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে 'আমার মেয়ে'! শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে স্বামীজি গিয়েছিলেন ভারতের উদারতম উপলব্ধি-প্রসূত সত্য প্রকাশে। তিনি সেখানে পাশ্চাত্যবাসীর মন জয় করেন, সামান্য এক মন্ত্রে আমেরিকাবাসী সকলকে তিনি 'আমার ভ্রাতা ও ভগিনী' বলে সম্বোধন করেন। প্রথম পরিচয়েই রোমাঞ্চিত হয় আমেরিকা। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ভারত পেয়েছে আরও অসংখ্য ভগিনীকে, যাদের বেশিরভাগের কীর্তিগাথা অবশ্য লেখাজোকা নেই।

শুধু বেদ, পুরাণ, মহাকাব্য, ইতিহাসে নয়, বাংলার লোককাহিনীতেও ভগিনীদের স্থান অনেক উঁচুতে। সাত চম্পা ভাইয়ের বোন পারুল, অরুণ-বরুণের বোন কিরণমালাসহ এমন অনেকের পবিত্র-সম্পর্কের কথা ধরা আছে অগণিত গল্পে। সেখানে কোথাও কোথাও মহত্ত্বের দিক থেকে ভগিনীরাই ছাপিয়ে গিয়েছেন ভাইদের। এই প্রসঙ্গে সর্বজনের 'দিদি'- আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করতেই হয়। মনে আসে, উত্তরপ্রদেশের 'বহিন' মায়াবতীরও নাম। রাজনীতির কথাই যখন এল, তখন কল্পনা করি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ভাইফোঁটা পেতে পারতেন, তবে কি বাংলার আবহ কিছুটা শান্ত হত? একইভাবে মায়াবতী যদি মুলায়ম সিং যাদবকে, রাবড়ি দেবী নীতীশ কুমারকে কিংবা জয়ললিতা এম করুণানিধিকে ফোঁটা দিতে পারতেন, তাহলেও তো অর্ধেক ভারতে সুখ-শান্তির বারিধারা নেমে আসতে পারত!..... ❑

একাদশী তত্ত্ব ও একাদশীব্রত মাহাত্ম্য

নির্মলচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী

পদ্মপুরাণে একাদশী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। একসময় জৈমিনি ঋষি তাঁর গুরুদেব মহর্ষি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে গুরুদেব! একাদশী কি? একাদশীতে কেন উপবাস করতে হয়? একাদশী ব্রত করলে কি লাভ? একাদশী ব্রত না করলে কি ক্ষতি? এ সব বিষয়ে আপনি দয়া করে বলুন।

মহর্ষি ব্যাসদেব তখন বলতে লাগলেন - সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর ভগবান এই জড় সংসারে স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করলেন। মর্ত্যলোকবাসী মানুষদের শাসনের জন্য একটি পাপপুরুষ নির্মাণ করলেন। সেই পাপপুরুষের অঙ্গগুলি বিভিন্ন পাপ দিয়েই নির্মিত হল। পাপপুরুষের মাথাটি ব্রহ্মহত্যা পাপ দিয়ে, চক্ষুদুটি মদ্যপান, মুখ স্বর্ণ অপহরণ, দুই কর্ণ-গুরুপত্নী গমন, দুই নাসিকা-স্ত্রীহত্যা, দুই বাহু-গোহত্যা পাপ, গ্রীবা-ধন অপহরণ, গলদেশ-ভ্রূণহত্যা, বক্ষ-পরস্ত্রী গমন, উদর-আত্মীয়স্বজন বধ, নাভি-শরণাগত বধ, কোমর - আত্মশ্লাঘা, দুই ঊরু-গুরুনিন্দা, শিশ্ন- কন্যা বিক্রি, মলদ্বার-গুপ্তকথা প্রকাশ পাপ, দুই পা- পিতৃহত্যা, শরীরের রোম-সমস্ত উপপাতক। এভাবে বিভিন্ন পাপ দ্বারা ভয়ঙ্কর পাপপুরুষ নির্মিত হল।

পাপপুরুষের ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে ভগবান শ্রীবিষ্ণু মর্ত্যের মানব জাতির দুঃখমোচন করবার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন গরুড়ের পিঠে চড়ে ভগবান চললেন যমরাজের মন্দিরে। ভগবানকে যমরাজ উপযুক্ত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি তাঁর পূজা করলেন।

যমরাজের সঙ্গে কথোপকথনকালে ভগবান শুনতে পেলেন দক্ষিণ দিক থেকে অসংখ্য জীবের আর্তক্রন্দন ধ্বনি। প্রশ্ন করলেন–এ আর্তক্রন্দন কেন?

যমরাজ বললেন, হে প্রভু, মর্ত্যের পাপী মানুষেরা নিজ কর্মদোষে নরকযাতনা ভোগ করছে। সেই যাতনার আর্ত চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

যন্ত্রণাকাতর পাপাচারী জীবদের দর্শন করে করুণাময় ভগবান চিন্তা করলেন - আমিই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেছি, আমার সামনেই ওরা কর্মদোষে দুষ্ট হয়ে নরক যাতনা ভোগ করছে, এখন আমিই এদের সদ্‌গতির ব্যবস্থা করব।

যন্ত্রণাকাতর পাপাচারী জীবদের দর্শন করে করুণাময় ভগবান চিন্তা করলেন - আমিই সমস্ত প্রজা সৃষ্টি করেছি, আমার সামনেই ওরা কর্মদোষে দুষ্ট হয়ে নরক যাতনা ভোগ করছে, এখন আমিই এদের সদ্‌গতির ব্যবস্থা করব।

ভগবান শ্রীহরি সেই পাপাচারীদের সামনে একাদশী তিথি রূপে এক দেবীমূর্তিতে প্রকাশিত হলেন। সেই পাপীদেরকে একাদশী ব্রত আচরণ করালেন। একাদশী ব্রতের ফলে তারা সর্বপাপ মুক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করল।

শ্রীব্যাসদেব বললেন, হে জৈমিনি! শ্রীহরির প্রকাশ এই একাদশী সমস্ত সুকর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত ব্রতের মধ্যে উত্তম ব্রত।

কিছুদিন পরে ভগবানের সৃষ্ট পাপপুরুষ এসে শ্রীহরির কাছে করজোড়ে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগল – হে ভগবান! আমি আপনার প্রজা। আমাকে যারা আশ্রয় করে থাকে, তাদের কর্ম অনুযায়ী তাদের দুঃখ দান করাই আমার কাজ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি একাদশীর প্রভাবে আমি কিছুই করতে পারছি না, বরং ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি। কেননা একাদশী ব্রতের ফলে প্রায় সব পাপাচারীরা বৈকুণ্ঠের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে। হে ভগবান, এখন আমার কি হবে? আমি কাকে আশ্রয় করে থাকব? সবাই যদি বৈকুণ্ঠে চলে যায়, তবে এই মর্ত্য জগতের কি হবে? আপনি বা কার সঙ্গে এই মর্ত্যে ক্রীড়া করবেন?

পাপপুরুষ প্রার্থনা করতে লাগল– হে ভগবান, যদি আপনার এই সৃষ্ট বিশ্বে ক্রীড়া করবার ইচ্ছা থাকে তবে, আমার দুঃখ দূর করুন। একাদশী তিথির ভয় থেকে আমাকে রক্ষা করুন। হে কৈটভনাশন, আমি একমাত্র একাদশীর ভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন করছি। মানুষ, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ, জল-স্থল, বন-প্রান্তর, পর্বত-সমুদ্র, বৃক্ষ, নদী, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সর্বত্রই আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু একাদশীর প্রভাবে কোথাও নির্ভয় স্থান পাচ্ছি না দেখে আজ আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

হে ভগবান, এখন দেখছি, আপনার সৃষ্ট অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একাদশীই প্রাধান্য লাভ করেছে, সেইজন্য আমি কোথাও আশ্রয় পেতে পারছি না। আপনি কৃপা করে আমাকে একটি নির্ভয় স্থান প্রদান করুন।

পাপপুরুষের প্রার্থনা শুনে ভগবান শ্রীহরি বলতে লাগলেন–হে পাপপুরুষ! তুমি দুঃখ করো না। যখন একাদশী তিথি এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করতে আবির্ভূত হবে, তখন তুমি অন্ন ও রবিশস্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করবে। তা হলে আমার মূর্তি একাদশী তোমাকে বধ করতে পারবে না।

একাদশীব্রত মাহাত্ম্য (ভদ্রশীলের কাহিনী)

পুরাকালে গালব নামে এক মহান মুনি নর্মদা নদীর তীরে বাস করতেন। তাঁর ভদ্রশীল নামে এক বিষ্ণুভক্ত পুত্র ছিল। সে ছোটবেলা থেকে বিষ্ণুমূর্তি বানিয়ে পূজা করত। বালক হয়েও লোককে বিষ্ণুপূজার উপদেশ ও একাদশী পালন করতে নির্দেশ দিত, নিজেও পালন করত। পিতা একদিন জিজ্ঞাসা করেন–"আচ্ছা ভদ্রশীল! তুমি অতি ভাগ্যবান। তুমি বলো তো প্রতিদিন শ্রীহরির পূজা করা, একাদশী তিথি পালন করা - এরূপ ভক্তি কিভাবে তোমায় উদয় হল?"

উত্তরে ভদ্রশীল বলতে লাগল - বাবা! আমি পূর্বজন্মের কথা ভুলিনি। আগের জন্মে যমপুরীতে গিয়েছিলাম। সেখানে যমরাজ আমাকে এ বিষয়ে উপদেশ করেছিলেন। পিতা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন - ভদ্রশীল, তুমি পূর্বে কে ছিলে? যমরাজ তোমাকে কি বলেছিল, সব কিছুই আমাকে বলো।

ভদ্রশীল বলল - বাবা! আমি পূর্বে চন্দ্রবংশের এক রাজা ছিলাম। তখন আমার নাম ছিল ধর্মকীর্তি। ভগবান দত্তাত্রেয় আমার গুরু ছিলেন। নয় হাজার বছর আমি পৃথিবী শাসন করেছিলাম। বহু ধর্ম-কর্ম করেছিলাম। পরে যখন আমার অনেক ধনসম্পদ হল তখন আমি পাগলের মতো অধর্ম করতে লাগলাম। কতকগুলি পাষণ্ড ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতাম। আর কেবল কথা আলাপের ফলেই আমার বহু দিনের অর্জিত পুণ্য নষ্ট হয়ে গেল। আমি পাষণ্ডী হয়ে গেলাম। তাদের কুযুক্তি

নিয়ে যাগযজ্ঞ আদি পুণ্যকর্ম বাদ দিলাম। ফলে আমার সব প্রজারাও অধর্ম করতে লাগল। প্রজাদের প্রত্যেকের অধর্মের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকেই গ্রহণ করতে হয়।

একদিন আমি সৈন্যদের সঙ্গে বনে মৃগয়া করতে গেলাম। বহু পশু বধ করলাম। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর ও ক্লান্ত হয়ে রেবা নদীর তীরে গেলাম। প্রখর রোদে তপ্ত হয়ে নদীতে স্নান করলাম। কিন্তু আমার কোন সেনাকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত ও অতিশয় ক্ষুধার্ত হলাম। অন্ধকার হয়ে এল। আমি পথ ঠিক করতে পারলাম না। এক জায়গায় গিয়ে কয়েকজন তীর্থবাসীকে দেখলাম। জানলাম তারা একাদশী ব্রত করছে। তারা সারাদিন কিছু খায়নি, জলপান পর্যন্তও করেনি। আমি তাদের সঙ্গে পড়ে রাত্রি জাগরণ করলাম। কিন্তু ক্লান্তি ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে রাত্রি জাগরণের পর আমার মৃত্যু হল। তখন দেখলাম বড় বড় দাঁত বিশিষ্ট দু'জন ভয়ংকর যমদূত এসে আমাকে দড়ি দিয়ে বাঁধল। আর ক্লেশময় পথ দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলল। তারপর যমপুরীতে পৌঁছলাম। যমরাজও দেখতে তখন ভয়ংকর। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে ডেকে আমাকে দেখিয়ে বললেন - পণ্ডিত! এই ব্যক্তির যেরূপ শিক্ষাবিধান তুমি তা বলো। চিত্রগুপ্ত কিছুক্ষণ বিচার করে ধর্মরাজ যমকে বললেন - হে ধর্মপাল। এই ব্যক্তি পাপকর্মেই রত ছিল সত্য, কিন্তু তবুও একাদশীর উপবাস জন্য সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। তীর্থবাস ও রাত্রি-জাগরণও করেছে। তাই ওর সব পাপ নষ্ট হয়েছে।

চিত্রগুপ্ত এই কথা বললে যমরাজ চমকে উঠলেন, তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে আমাকে পূজা করতে লাগলেন। তারপর তাঁর দূতদের আহ্বান করে বলতে লাগলেন–হে দূতগণ! তোমরা ভাল করে আমার কথা শোনো। তোমাদের মঙ্গলজনক কথা আমি বলছি। যে সব মানুষ ধর্মরত, তোমরা তাদেরকে এখানে আনবে না। যাঁরা শ্রীহরির ভক্ত, পবিত্র, একাদশীব্রত পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁদের মুখে সর্বদা ' হে নারায়ণ, হে গোবিন্দ, হে কৃষ্ণ, হে হরি' উচ্চারিত হয়; যাঁরা সকল লোকের হিতকারী ও শান্তিপ্রিয়, তাদেরকে তোমরা দূর থেকেই পরিত্যাগ করবে। কারণ, সেই সব ব্যক্তিকে আমার শিক্ষা দেবার অধিকার নেই। যাঁরা সর্বদা হরিনামে আসক্ত, সর্বদা হরিকথা শ্রবণে আগ্রহী, যাঁরা পাষণ্ডগণের সঙ্গ করে না, ভক্তদের শ্রদ্ধা করে, সাধুসেবা অতিথিসেবা পরায়ণ, তাঁদেরকে পরিত্যাগ করবে।

'হে দূতগণ! তোমরা শুধু তাদেরকেই আমার কাছে ধরে আনবে, যারা উগ্রস্বভাব, ভক্তদের অনিষ্ট করে, লোকদের সঙ্গে কলহ বাধায়, একাদশীর ব্রত পালনে একান্ত পরাঙ্মুখ, পরনিন্দুক, ব্রাহ্মণের ধনে লোভ পরতন্ত্র, হরিভক্তি বিমুখ, যারা ভগবদ্ বিগ্রহ দেখে শ্রদ্ধাবত হয় না, মন্দির দর্শনে যাদের আগ্রহ নেই, অন্যের অপবাদ করে বেড়ায়, তাদের সবাইকে বেঁধে এখানে নিয়ে আসবে।'

যমরাজের মুখে এসব কথা শুনে আমি আমার পাপকর্মের জন্য অত্যন্ত অনুশোচনা করতে থাকি। তারপর আমি সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেহ লাভ করলাম। একটি দিব্য বিমানে চড়িয়ে আমাকে যমরাজ দিব্যলোকে পাঠিয়ে দিলেন। কোটি কল্প সেখানে অবস্থান করার পর ইন্দ্রলোক, স্বর্গে নেমে আসি। সেখানে বহুকাল যাবৎ অবস্থান করার পর এই পৃথিবীতে এসে সদাচারী মহান ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছি।

আমার জাতিস্মরতা হেতু এসব ঘটনা আমার হৃদয়ে জাগ্রত আছে। আমি পূর্বে একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য জানতাম না। অনিচ্ছাকৃতভাবে যখন একাদশী পালনে এত ফল লাভ করেছি। তাহলে ভক্তি সহকারে একাদশী ব্রত উপবাস করলে কি প্রকার ফল লাভ হয় তা জানি না। তাই বৈকুণ্ঠধামে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছায় আমি পবিত্র একাদশীব্রত ও প্রতিদিন বিষ্ণুপূজা করব এবং অন্যদেরও এসব পালন করতে উৎসাহী করব।

পুত্রের কথা শুনে গালব মুনি অতি সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, আমার বংশে এই পরম বিষ্ণুভক্তের জন্ম হয়েছে, তাই আমার জন্ম সফল, আমার বংশও পবিত্র হল। ❑

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥

[অ : ৩, শ্লোক : ৩৮]

অনুবাদ ঃ ধূমের দ্বারা অগ্নি, ময়লার দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ যেমন আবৃত থাকে, তেমনই এই কাম দ্বারা জীবাত্মার জ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে।

[অ : ৩, শ্লোক : ৩৮]

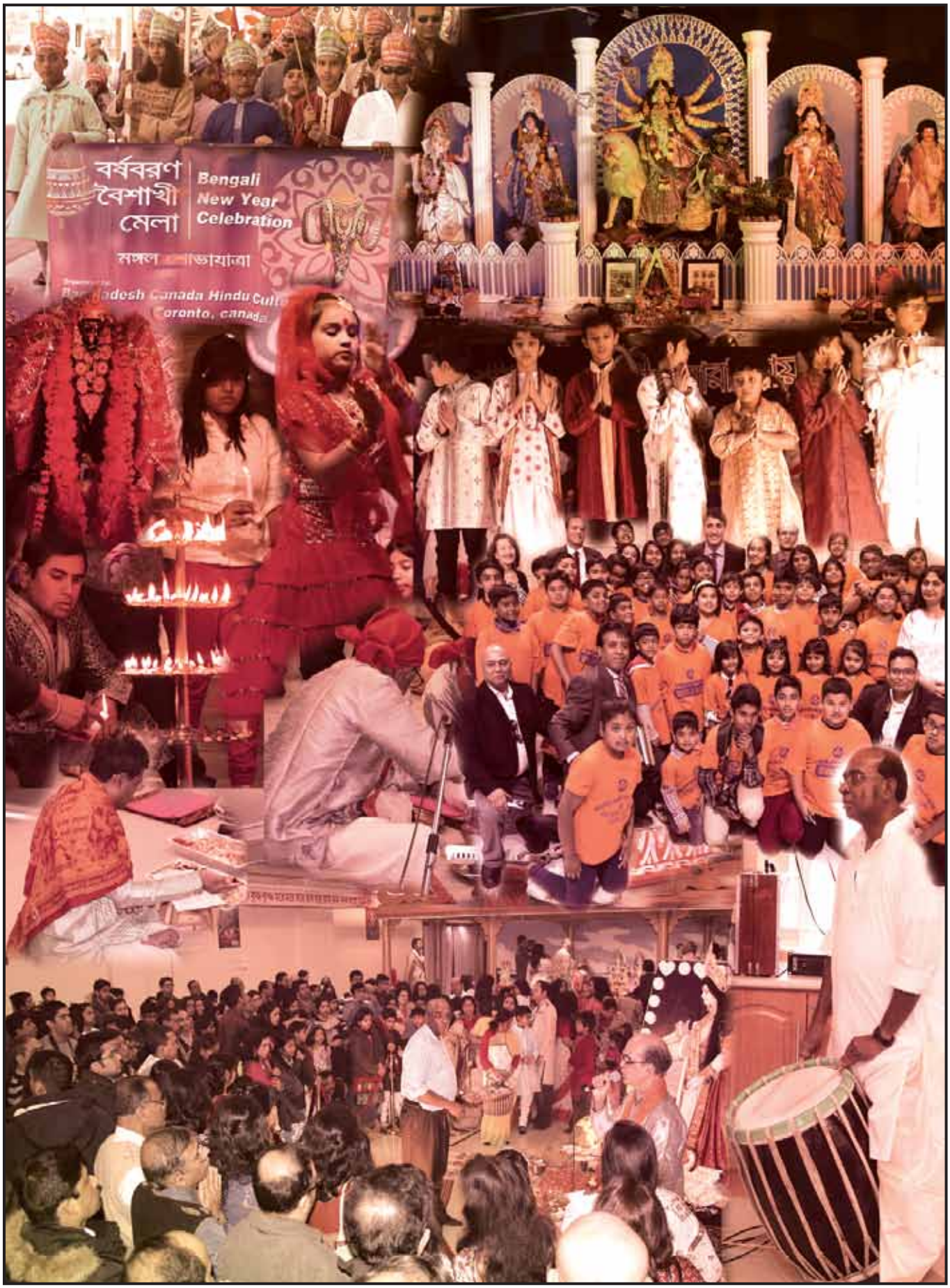
বর্ষবরণ
বৈশাখী
মেলা
Bengali
New Year
Celebration

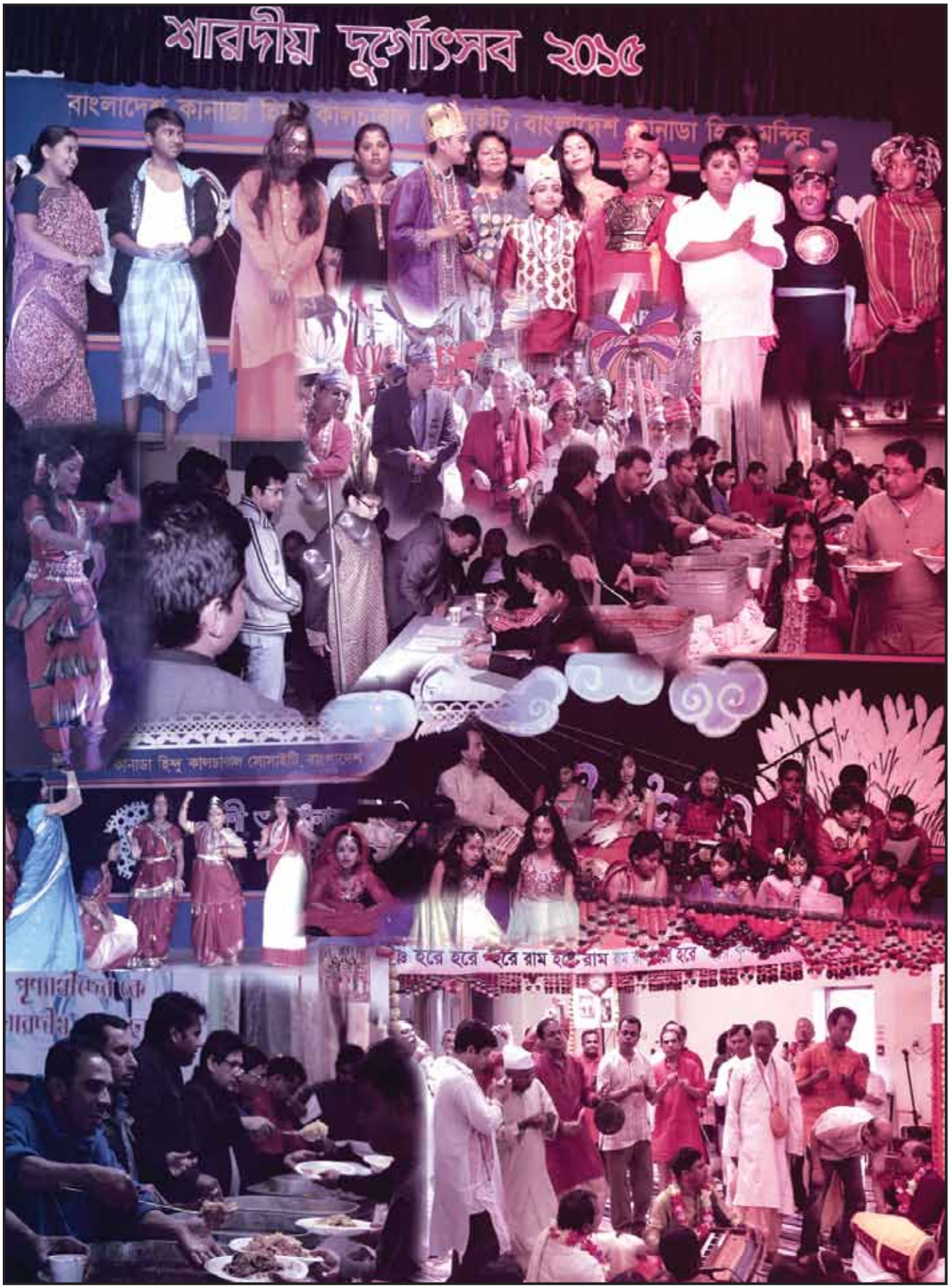
শারদীয় দুর্গোৎসব ২০১৫

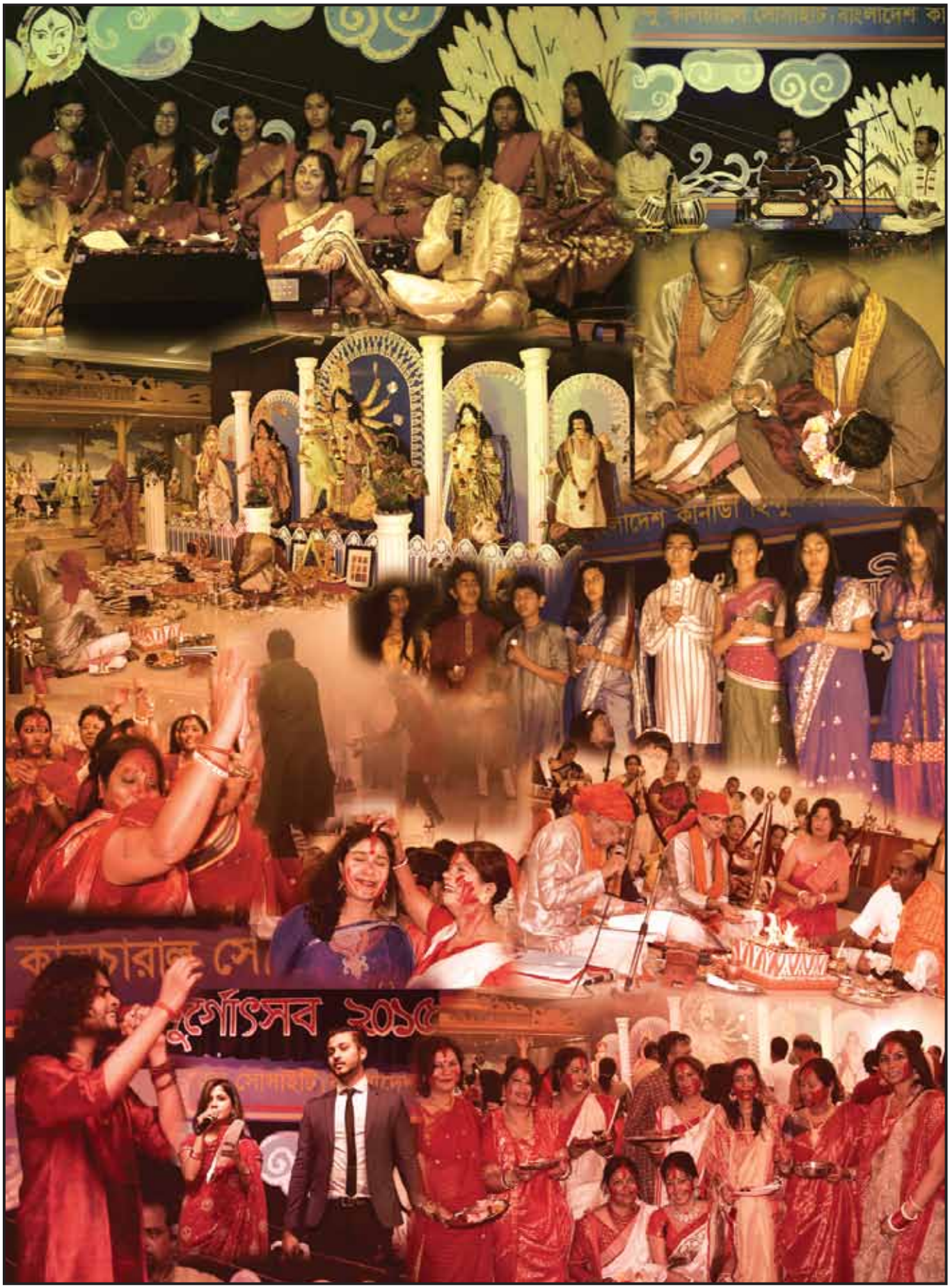
দুর্গোৎসব ২০১৫